ডিকম নদীৰ দলং

ডিকম নদীর দলং

[কাহিনী]

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

পপুলার লাইব্রেরী
১৯৫/১বি, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৬

সমাজ সেবার আদর্শগুরু

শ্রীবিনয়ভূষণ সেনগুপ্তের

চরণকমলে

ভূমিকা

ভারতীয় চা-শিল্প ইংলণ্ডের শিল্প-বিপ্লবের উপস্বত্ব। শিল্প-বিপ্লবের অঙ্কুরোদ্গম অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে; তথাপি তার পত্রোদ্গম হল এসে উনবিংশ শতকের দ্বিতীয় আর তৃতীয় দশকে।

ভারতবর্ষ তখনও আওরংজেবী অত্যাচার আর নিপীড়নের জ্বালা থেকে নিরোগ হোয়ে ওঠে নি; পর্তুগীজ দস্যুতার ব্যভিচার তার উপরে দেশটাকে একেবারে যেন জবুথবু করে ফেলেছিল। অর্থ-নৈতিক প্রজ্ঞা এবং রাষ্ট্রনীতির গাঁথুনি তো দূরের কথা, লোকগুলো যেন কর্মশক্তি, কর্মপ্রেরণা বিচারবুদ্ধি সবই হারিয়ে ফেলেছিল; এমন কি বাঁচার সাধ, বেঁচে থাকার আনন্দ, সমাজ, সামাজিক-জীবন সবকিছু ব্যাপারেই কেমন নিষ্ক্রীয় নিষ্কর্মা হোয়ে পড়েছিল। এমনই সময়ে এল ইংরেজ।

ইংরেজ একদিকে প্রতিযোগী ভারতীয় শিল্প ও শিল্পোৎপাদন নানা উপায়ে পংগু ও বিনষ্ট করে দিল; আর সংগে সংগে নিজেদের একান্ত আয়ত্বাধীনে সম্ভাবনাময় নূতন শিল্প স্থাপন করতে লাগল। চা-কৃষি-শিল্প এইগুলির মধ্যে অন্যতম।

ভারতের চা-শিল্প সোয়াশ বছরের; ইংলণ্ডের শিল্প-বিপ্লবের অনুসংগী। শিল্প-বিপ্লবের ফলে ইংরেজদের স্বদেশে শ্রমিকদের যে সুবিধা-সুযোগ দিতে হয়েছিল, তা সুদে-আসলে উসুল করে নেয়ার নূতন সূত্র পাওয়া গেল ভারতে।

চা-কৃষি-শিল্পে প্রচুর জনবল প্রয়োজন। আসাম, দার্জিলিং ও

তরাই অঞ্চলে লোক বসতি অল্প ; অথচ এই সকল অঞ্চলের মাটি চা-চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। এই নবাবিষ্কৃত কৃষি ও কৃষি-শিল্প চালু করার জন্যে শ্রমিক সংগ্রহ হতে লাগল সমগ্র ভারতবর্ষে বিভিন্ন অংশে থেকে।

টাকার লোভে পোড়ে, দাদন নিয়ে বহুলোক এসে চা-কৃষি-শিল্পে যোগ দিয়েছিল। কিন্তু নূতন পরিবেশে নূতন আবহাওয়ায় অনেকেরই স্বাস্থ্য নষ্ট হোয়ে যেতে লাগল। রোগ-মৃত্যু-ভয়—লোক পালাবার চেষ্টা করে। সুতরাং প্রথম নম্বর এগ্রিমেণ্ট চলল, দ্বিতীয় নম্বর চলল নিপীড়ন, তৃতীয় প্রলোভন—মদ, মদ্যেতর মাদক সামগ্রী আর দেহভোগ।

প্রথম প্রথম কর্মকর্তা যারা আসত তারা প্রায়ই একা আসত—নারী বা স্ত্রী সংগে কারুর বড় থাকত না। তা ছাড়া চালক হোয়ে যারা আসত তারা ইংলণ্ডের যেই সমাজ-স্তর থেকে আসত তারা দেহভোগকে অন্ততঃ দোষণীয় মনে করত না। কাজেই নারী কর্মীদের জীবনে এল নূতন প্রেরণা, নব উন্মাদনা। অন্যদিকে চা-শিল্পে মেয়ে শ্রমিক অর্ধেকেরও বেশি। উভয় পক্ষেরই সুবিধা-সুযোগ ঘটছিল প্রচুর।

দুইটি সংস্কৃতির এইরূপ বিকৃত সংমিশ্রণে এক বিচিত্র সংস্কৃতির জন্ম হল। এই শংকর সংস্কৃতির জনসমাজই আজিকার চা-কৃষি শ্রমিক—চা-অঞ্চলে জনগণের মধ্যে বৃহত্তম অংশ পূরণ কোরে আছে।

সমাজ এবং সামাজিক নিয়ম-নিষ্ঠাও এদের মধ্যে এক বিরাট শাংকর্য নিয়ে গোড়ে উঠেছে। এদের ভাষাও কোন আঞ্চলিক

ভাষার সংগে সংগতি রাখে নি—এদের ভাষা নূতন ধরণে তৈরী।

বাহ্যতঃ এদের মনে হবে সেই উনবিংশ শতকের মানুষ। কিন্তু একটু মেলামেশা করলেই বেশ বোঝা যায় আধুনিক হাওয়া এদের গায়েও ছোঁয়া লেগেছে, এদের মনেও দোলা দিয়েছে।

বড়বেহেরা, কোন্নগর
হুগলী
২রা অক্টোবর, ১৯৫৮

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

উত্তর-পশ্চিম কোণে কালো আকাশ। ডানা ছড়িয়ে চলেছে মেঘ। বিশাল পাখা মেলে কোন পাখী যেন দৈত্যের আকার ধোরে সারা পৃথিবীটাকে ঢেকে ফেলতে চাইছে। সূর্য গেছে চাপা পোড়ে; কেবল দৈত্যটার কালো ডানার পেছন দিয়ে পা-টা কি হাত-টা বুঝি সে একবার-দু-বার বাড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেছিল। তাই আলোর চিকনাই এক আধটুকু বেরিয়েই অন্ধকারে চাপা পোড়ে গেল।

ঘরের দাওয়ায় বোসে নবমী সেই দিকে তাকিয়ে দেখছিল। একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস কেমন যেন অজানতেই তার বেরিয়ে এল বুকের কোন গভীর থেকে।

দুনিয়াটাই এমন! সুন্দর সূর্য সাঁঝের আমেজ-লাগা মিঠা রোদ্দুর—সুন্দর মুখের আবেশের হাসির মত কেমন ফুটি-ফুটি যাই-যাই ভাব। তা দৈত্যপানা কালো মেঘের সে সইবে কেন? মেরে দিল তার কালো ডানার ঝাপটা, বাড়িয়ে দিল ডানাটা; ঢেকে দিল মুখখানা। চেহারার সংগে স্বভাবের বড় মেল থাকে কিনা! কালো মেঘের ভালো লাগবে কেন ঐ ফুট্-ফুটে মিঠে-মিঠে আলো! তার কাছে দুনিয়াটাকেই কালো করে দেয়া ভালো! ঢেকে দিল তাই তার নিজের কালিমা দিয়ে; অন্ধকারে ভোরে দিল পৃথিবী।

নবমীর মনটাতেও কেমন যেন কালো-কালো দাগ-লাগা মত হোয়ে উঠেছে। বেদনা? না, বেদনা নয় তো। বেদনা কিসের, কার জন্য? আর বেদনার জায়গাই বা আছে কোথা তার সারা

মনটাতে ? মনে আর বেদনায় তো একাকার হোয়ে গেছে। বেদনা থেকে মনটাকে আলাদা কোরে পায় বা কখন ! কখন বা মনকে বাদ দিয়ে বেদনাটাকে সে পরখ কোরে দেখতে পারে !

উত্তর-পশ্চিম কোণ থেকে দমকা হাওয়া ছুটে আসছে। বড় বড় গাছগুলোর মাথা দুমড়ে দিল দক্ষিণ-পূব মুখো। দুমড়ে বুঝি ভেংগেই ফেলবে ! কি ভীষণ আওয়াজ তার—যেন পাঁচটা পুরনো মোটর লরী কাদা-পথে টেনে এগিয়ে আসছে। তোলপাড় কোরে এসে নিমেষে পোঁছে গেল গুটী-বাড়িতে।

সারি সারি চা-গুটীর গাছ। দেবদারু গাছের মত পেট-মোটা সরু মাথা মোচার ঢং গাছগুলো। মাথায় প্রায় একই সমান সব গাছ ; হাজার হাজার চা-গুটীর গাছ। সারের মাঝে চোলে গেছে লম্বা আল-পথ। সেই গুটী-গাছের পলকা ডালে এসে লাগল বাতাস—ডালগুলোকে বুঝি দুমড়ে ভেংগে ছত্রখান কোরে দেবে। আহা ! বাগিচাটা বুঝি এক নিমেষেই মাটি হোয়ে যাবে !

দেবে বই কি ! গাছের পলকা ডাল, গাছের যাবে। কালো দৈত্যটার চেলার তাতে কি ? ওর ধর্মই ভেংগে-চুরে সুন্দর সুসংবদ্ধকে কুৎসিত বিস্রস্ত কোরে দেয়া। ওর কাছে পলকা কি, সুন্দরই বা কি ?

আহা ! অমন সুরত বাগিচাটার !—নবমীর মুখে কথাটা যেন কোত্থেকে এসে বেরিয়ে গেল পরিস্ফুট হোয়ে।

কোত্থেকে আবার ! নবমীর পলকা মনটাও এমনই একটা দমকা হাওয়ায় আজ ছন্দহারা হোয়ে গেছে। তার মনটাই বা এমন সুন্দর কম কি ছিল !

কালো মেঘ, এল ঝড়। এল তারই পেছন-পেছন বরষা —

ঝম্-ঝম্-ঝম্ সর্-সর্ টপ্-টপ্ শত বাজনা শত হাততালি—চারিদিকে বৃষ্টি-ধারার অবিরাম শব্দ। নবমী দাওয়ায় বোসে। বাতাসে বর্ষণ-ধারার জল গুঁড়ো-গুঁড়ো হোয়ে উড়ে উড়ে এসে পড়তে লাগল নবমীর মাথায় মুখে সর্বাংগে। বেশ লাগে জলের গুঁড়োর মিঠে মিঠে ঠাণ্ডা পরশ। বেশ লাগে!

—বেশ লাগে, ভাল্-এ।—উল্টনের বড় বাবুর মাইকিঠু মুখে একদিন লগাই দিলেক বগা-বগা বস্তুটা, কিনা বলে!—নামটা ভুলে যায় নবমী স্নোর। অনেক দিনের কথা!

—হি মেমসায়েবরা যে মুখে মাথে!—নামটা কিছুতেই মনে করতে পারে না আর।—সেই রকম লাগে যে নবমীর, ফুর্-ফুরে ছোঁয়া জলের গুঁড়োর। তবে গন্ধ!—

নবমী চোলে গেল কিশোর বয়সে—তখন তার বয়স চৌদ্দ-কি পনেরো। উইলটনের বড়বাবুর ছেলেমেয়েদের খেলা দেবার জন্য ছুকরী চাই। ছুকরী মানে—অল্পবয়সী মেয়ে, হাতে পায়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, চেহারাটাও বা একটু ভাল হোলে মন্দ কি! নইলে উইলটন বাগানে কুলির অন্ত কিছু ছিল না। তাদের কত মেয়ে আছে—ছুকরী। কিন্তু চেহারা!

তা চেহারা যেমন তেমন। হাতে পায়ে-এমনিতে নোংরা নয়! তবু যেন কেমন নোংরা নোংরা ভাব। বড়বাবুর স্ত্রীর তাদের তাই পছন্দ হয় না। তবে পাওয়া বা যায় কোথায়?

এখানে-ওখানে, এ-বাগানে ও-বাগানে—চা-বাগিচার অভাব কি! পাশাপাশি কম হোলেও পঞ্চাশটার কম তো নয়। সৈকিয়া বাবু, ধরবাবু, বরা, ·বড়ুয়া, কাকতি, সাহা, পালমশাই, চলিহা—

বড়বাবুর জানাশোনা দশটা বাগানের কেউ বাদ গেল না। একটা ছুকরী—মানে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন মেয়ের জোগাড় করতে সবাই চেষ্টা করল। নাঃ—তেমন পাওয়া যায় না।

কলকাতার মেয়ে বড়বাবুর স্ত্রী। যত খবর আসে সবটাই নাকচ কোরে দেয় সে। সবাই বলে গোড়ে-পিটে তৈরী কোরে নিতে হবে একটু। তা কেন? হাজার হাজার লোকের মধ্য থেকে একটা মেয়ে পাওয়া যায় না? যায় বৈ কি, যায়! তবে।—

তবে আবার কি? ঐ মিশ্ কালো কাপড়ের পাঁচ হাত টুকরোটাকে সায়ার উপরে জড়িয়ে নেবে। গায়ে একটা পেট-বারকরা ব্লাউজই বল আর কাঁচুলিই বল—তাই পরবে ওরা। নইলে গরীব মানুষ, অত ফরসা-ফরসা কাপড়-জামা বদলাতে পাবে কোথা! ওগুলো নোংরা নয়, চেহারাই ঐ। কেচে পরিষ্কার করে অবশ্যই—তবে হপ্তায় একদিন। আর তা ছাড়া সময় বা কোথায়! মেয়ে-পুরুষ দু-জনই তো কামজারি বেরোয় সপ্তাহে ছয় দিন। ঐ একটাই তো দিন সাত দিনের মধ্যে।

মেয়ে-পুরুষে রোজগার করে, তবে কাপড়-জামায় অত কষ্ট কিসে? গরীব না হাতি। ও ওদের স্বভাব। নোংরা না কি? নোংরাই তো!—কলকাতার মেয়েকে কে বোঝাবে? এদের যে একটা প্রাচীন ঐতিহ্য রোয়ে গেছে। এসব নবমীর শোনা কথা।

আজ আবার মনে পড়ে—উইলটনে বড়বাবুর স্ত্রী বলত বোসে বোসে হেসে হেসে—তোদের তুক্ করেছিল সায়েবরা তোদের বুড়ো বাবাদের।

বাংলা বলতে শেখেনি নবমী; তবে বুঝতে পারে। বড়বাবুর

মাইকি বলত—সেই সোয়াশ বছর আগে—১৮২৫ না কি ১৮৩২ সালে—ঠিক মনে পড়ছে না আজ নবমীর। বড় ভুল হয় কথা এখন তার। তখন কিন্তু খুব তার মনে থাকত। সাতদিনে ইংরেজি হরপ শিখেছিল সে উইলটনে বড়বাবুর মাইকির কাছে। সেই দৌলতে আজও ইংরেজি হরপে লোকের নাম জায়গার নাম সে পড়তে পারে। তারই কাছে শুনেছে সে—ঐ কত সালে ইংরেজ গাছ রোপাই কোরে চা-বাগিচা খুলল। তখন অসম দেশে জংগল, কেবল জংগল—মানুষ ক-টা বা ছিল আর! চা-চাষী সায়েবরা সেই ভাটি থেকে আর কোথা থেকে কোথা থেকে মানুষজন সব ধোরে ধোরে নিয়ে আসত। এনে ভুক্ করত। ওরা খেত কি সব শেরি-মেরি, আর কুলিদের ধরিয়ে দিল হাঁড়িয়া।

অসম দেশে বোরো ধানের চাষ অনেক। তারই ভাত পচিয়ে মদ—কুলি সমাজের শেরি। ভুক করেছিল কি না? তাই দশ জায়গার দশটা সমাজ ভেংগে এনে জড় যে করেছিল—তার মোহ চাই।

ওরা পাঁচ বাগানের পাঁচ-দশটা সাহেব-মেম এক জায়গায় হোয়ে খানা-পিনার-পরে মদ খেয়ে এর-ওর মেম অদল-বদল কোরে নাচত ধেই-ধেই কোরে। তাই তোদের তারা শিখিয়ে দিয়ে গিয়েছে। ছুটীর দিনে হাঁড়িয়া খাস আর মেয়ে-মরদায় নাচিস্। ওরাই শিখিয়েছে তোদের মোটা-মাইকির ভাগাগাগি; আজ এ মাইকি কাল ও মাইকি, আজ মোটা ধরা কাল মোটা ছাড়া। ওরাও তো এক সায়েব ছেড়ে আর এক সায়েব, এক মেমকে তাড়িয়ে আর এক মেম এমনই করত কিনা? বোকার দেশে কাঁচা

টাকার গরম ছিল ওদের। তোদের বাপ-দাদারা তাই শিখেছিল। নইলে আমাদের দেশে ছিল কি এসব নোংরামি!

নবমীর সব মনে পড়ে একটা একটা কোরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সেই কথাগুলো। আজ কথাগুলির অর্থ যেন স্পষ্ট বুঝতে পারে। নইলে—

নইলে ছোট বেলায় তার গর্ব ছিল কত! বাপের মুখে শুনেছিল—তার ঠাকুরদাদার মা ছিল কোন কৈলাবর না কোন বাগানের সায়েবের মেয়ে। তার মা ছিল রাজপুতানি—সায়েবের বাংলায় আয়া। আয়ার হোল ছেলে। মেমসায়েব তখন তাড়িয়ে দিল আয়াকে বাংলা থেকে।

নবমীর বড় গর্ব ছিল—খাস বিলাইতি সায়েবের খুন আছে তার শরীরে। তার যেই সম্পদ আছে তা অনেক কুলিরই নেই।

উইলটন বড়বাবুর মাইকি বলেছিল তাকে এই সব। রোজ দুপুরের পরে বোসে কত গল্প করত। এটা ওটা তো তার কাছেই শুনেছিল নবমী। চায়ের চাষ এমন কোরে আগে হয় নি। পাতাটা গাছটা লোকের জানা ছিল—বুঝি সেদ্দ-মেদ্দ কোরে খেতও মানুষে। জংগলে গাছ হোত আর দশটা জংগলা গাছেরই মত। কি সায়েবটার নাম? হাঁ, আজও মনে পড়ে বলেছিল বড়বাবুর মাইকি চায়ের কত গল্প পুরনো-পুরনো দিনের। সায়েবটার নাম ছিল—কি জানি ছাই! বুঝি একজনের বেশি; কেবল একটা হয় তো নাম নয়। মানুষগুলোকে দেখেছিল ওই পাতা জংগল থেকে এনে সেদ্দ কোরে খেতে।

বাঃ—বেশ তো! চীন দেশে এত ভাল হয় না তো! ব্যবসাদার ইংরেজ—গন্ধ পেয়ে গেল টাকার। আর কি!

হৈ-চৈ এখানে ওখানে এদেশে ওদেশে। আজ সেই জংগলের চা-গাছ এনে কত যত্ন কোরে সাজিয়ে কেটে-ছেঁটে কত কৃত চাষ—কত পয়সা!

মনে পড়ে নবমীর বড়বাবুর স্ত্রীর হাসি হাসি মুখে সেই ফাঁকে ফাঁকে বলা গল্পগুলি। তোরা—তোদের বাপ-দাদারা কি পেল? পেল, ঘটি ঘটি হাঁড়িয়া; তাই নিয়ে ন্যাংটো হোয়ে মেতে উঠল সব্। তাই নিয়ে মাতাল—নেংটি জোটে না পরতে—হাঁড়িয়া না হোলে নয়! পাঁচ বছরের বাচ্ছাটাকেও একটু একটু কোরে অভ্যেস করিয়ে রাখে। নইলে গরীবানায় খুসী থাকবে কিসে!—কথাগুলো পাতলা পাতলা ঠোঁটের ফাঁকে হালকাভাবে বেরিয়ে আসত তার মুখে থেকে।

কিন্তু নবমীর কেমন লাগত মনে কথাগুলো সব। অথচ সত্য বটে হাঁটতে শিখলেই একটু একটু হাঁড়িয়া খাওয়াতে সুরু করে বাপ-মায়ে।—লে-লে পিয়ে লে তানিক, ভাল্ আছে ভাল্ হব।—সে-ও তো খেয়েছে খেত। তার মা কত যত্ন কোরে খাইয়েছে একটু একটু।

ছুকরীর সায়েব মোটা হব, বগা রং লাল চুল, লে পি-লে!—আদর কোরে বলত নবমীর মা। আজও মনে পড়ে নবমীর মায়ের কথা। সে আজ কত দিনের কথা। পঁচিশ বছর আগেকার কথা। হাঁ, তাই হবে পঁচিশ বছর তো হবেই। তার নিজের বয়স তো ত্রিশ আজও ছাড়ায় নি।

কতটুকু জীবন, অথচ কত তার অভিজ্ঞতা! আজ কত কথা সে স্পষ্ট বুঝতে পারে; প্রাণে প্রাণে অনুভব করে, বেদনায় আজ

তার বুকটা টন্‌টন্ কোরে ওঠে। নিজের জন্য নয়, ইংরেজের গড়া চা বাগানের এই কুলি সমাজের জন্য। মানুষগুলোকে যেমন জগা-খিচুরি বানিয়েছে, ভাষাটা পর্যন্ত তেমন একটা খিচুরি ভাষা তৈরী হয়েছে—কুলি ভাষা। এ না অসমিয়া, না বাংলা, না হিন্দী। অথচ তিনটা এক সংগে। সমাজটা হয়েছে একটা বিচিত্র, জাতটার দাম নেই, হাল-চাল না হিন্দুস্থানী না ইংরেজী—ঐ একটা রকম! কিন্তু কি আর করা যাবে? এইটেই পাকা হোয়ে গেছে। এদের কি একটা উপায় করা যায় না? হাব-ভাব চাল-চলনকে মানুষের মত কোরে গোড়ে তোলা যায় না!

নবমীর এই ছোট্ট ত্রিশ বছরের জীবনে অনেক দেখল, অনেক জানল। কিন্তু বুঝেও সে কিছু করতে পারে না এদের জন্য। অসহায়ের মত সমস্ত বুকে তার হাউ হাউ একটা আর্তনাদ বাজে কেবল। পারে কি পারে না তাও বোলে বা তাকে দেয় কে! তাই তো—কে বা বোলে দেয়?

তখন উইলটনের বড়বাবুর মাইকি বলত, সে শুনত। বেদনা লাগত তখনও, কিন্তু সে ব্যথা ছিল অন্য রকমের। হেসে হেসে বলত বড়বাবুর স্ত্রী, আর তার মনে হোত যেন তাদের ঘৃণা করে।

গাঁও থেকে তুই এলি কি কোরে? এলি শুধু তোর ঐ চামড়াটার জোরে। নইলে যেই নোংরা জাত তোরা।—বলত বড়বাবুর স্ত্রী।

ঘৃণা করে অমন কোরে!—ভাবত নবমী।—কেন, কুলিরা কি মানুষ নয়?

আর সায়েবের পা-চাটা হোয়ে—। কি সব বলত সে।—নরক বাসে আনন্দ করত তোদের বাপ-দাদারা। আর সোনায়

মোড়া জাহাজ বানাল সায়েবরা। ওরা কত বেইমান যে রে তোরা বুঝবি নি।

কিন্তু নবমী তো গর্বই করত ঐ সায়েবের রক্ত আছে তার শরীরে তাই। নিজের দেহটার দিকে একবার তাকায় নবমী। হাঁ, সত্যই তো সায়েবের রং এখনও তো রয়েছে তার; এত দুঃখের পরেও। কিন্তু আজ যেন কেমন ঘিন্-ঘিন্ লাগছে তার এই রং এই দেহ।

কিন্তু সেই দিন ছিল তার রং গর্বের। আর না-ই বা থাকবে কেন? পঞ্চাশখানা বাগানে তো জোটে নি! শেষে সেই গাঁয়ে থেকেই তো নিয়ে আসতে হয়েছিল এই সায়েবের রক্তের মেয়েটাকে অনেক খোঁজা-খুঁজির পরে।

উইলটনের বড় বাবুর স্ত্রী বলেছিল তাই—কোথাও মিললে না আমার পছন্দের মত ছুকরী একটা। তারপর মুহুরী হাজারিকা বাবু দিলে তোর খবর। কি—ভাজনী গাঁয়ে আছে একটা ছুকরী। তোর রংটা দেখলুম ফরসা; বেশ ফরসা—সায়েবি। চোখটা তোর নীল। যদিও ভাল লাগে নি অমন নীল চোখ, তবু রংটা আছে গায়ের! মাথার চুল কটা। ভেবোছলাম—নিশ্চয় ও যত্ন না করার দরুণ। কিন্তু এখন দেখছি না, তা নয়; জাতটাই অমন। হাত পা-ও মনে হোল একটু যেন ধোয়া-মোছা—আর সব নরকের মত নয়।

তখন সায়েবি রক্তে তার মোহ লাগত। এই তো সায়েবি রংএর মেয়েকে বড় পছন্দ! সায়েবদের তখন তার বড় আপন বড় নিজের লোক বোলে মনে হোত। তাই সায়েবরা ডাকাত, সায়েবরা বদমায়েস, সায়েবরা ওদের নরক বানিয়েছে—এ সব

কথায় বড় বেদনা বোধ করত নবমী। অবিশ্যি সব কথা স্পষ্ট কোরে বুঝত না যদিও, তবু ইংগিতটা মোটামুটি সবই বুঝতে পারত। বড় বেদনা বোধ করত সে—কেন বড়বাবুর স্ত্রী ওদের বাপ দাদাকে ঘৃণা করে। সে ছিল তখন! কিন্তু আজ যদি তার দেখা পেত একবার, নবমী তবে জেনে নিত জাতটার ভালো কি আর হয় না? ভালো কি আর করা যায় না এই চা-কর কুলি জাতের!

আহা! সেই দিন যদি সে এমন কোরে বুঝতে পারত! সেই দিন যদি বেদনাটা তার এমনই কোরে বাজত বুকে! সেই দিন উল্টো কাঁটা বিঁধেছে তার বুকে—জ্বালা, বুঝি একটু রাগও বোধ করেছিল তখন। কেবল কি বড়বাবুর স্ত্রী! সবাই—যে আসত বড়বাবুর বাড়িতে সকলেরই এক কথা। বড়বাবুর বোন এল, শালার স্ত্রী এল, আরও সব কত এসেছে; কত দেখল সে! কত লোকের কত কথা শুনেছে। আড়াই বছর কম সময় নয়। সবাই কিন্তু নবমীর চেহারা হাল চাল কথাবার্তা সব পছন্দ করত। তাকে সবাই ভালবাসত। নবমীরও এমনিতে ভালই লাগত তাদের সবাইকে। কিন্তু তারা গালমন্দ করত কুলি জাতকে। নবমীর বড় অপমান বোধ হোত তাতে। তাদের কুলি জাতকে ঘৃণাই করে সবাই কেবল! কিন্তু কারুর কখনও ভাল তাদের করার চেষ্টা তো দেখেনি! কেউ দুনিয়ায় তাদের মংগল করার কথা ভাবেও না বুঝি!

সত্যই তো! যখন যেই আসত সবাই কুলিদের ঘৃণাই দেখাত। তবু তাকে সবাই ভালই বাসত। যে-ই যখন এসেছে, কাপড় জামা চিরুণী কাঁটা কত কিছু দিয়ে গেছে তাকে। আজ এগারো-বারো বছর পরেও কত রয়েছে সে সব এখনও তার

কাছে। সেই আড়াই বছরের স্মৃতি! আজ অনেক দিন পরে তা আবার সুখময় হোয়ে উঠেছে। বড়বাবুর মা দিয়েছিলেন বাক্স একটা—লোহার—মস্ত বাক্স। তারই মধ্যে সব রয়েছে যা কিছু পেয়েছিল উইলটনে সে। ঐগুলোই বুঝি আলো এনে দেবে তাকে? বড়বাবুর স্ত্রীর কথায় জ্বালা যেমন ছিল, সহানুভূতিও ছিল তেমন। তখন বোঝে নি, আজ সেই সহানুভূতির স্পর্শ বোধ করে নবমী। বড় জ্ঞান বুদ্ধি-ওয়ালা মেয়েমানুষ বড়বাবুর স্ত্রী। তাদের যদি আবার দেখা পেত সে আজ!

তোদেরকে যদি মানুষ কোরে তুলত কেউ—বলেছিল বড়বাবুর স্ত্রী একদিন। সেই দিন বড় লেগেছিল বুকে নবমীর। আমাদের জানোয়ার ভাবে? বলেনি কিছু মুখে; মনে মনে বেদনা বোধ করেছিল। কিন্তু আজ বোঝে কথাটা কত সত্য কত বড়! কত বেদনা আর সহানুভূতি লুকোনো ছিল মনে বড়বাবুর স্ত্রীর সেই কথার পেছনে। সত্যই তো! জানোয়ারই তো তৈরী হোয়ে আছে তাদের এই চা বাগানের কুলির গোষ্ঠী।

নিজেদের ভালমন্দ নিয়ে মাথা ঘামায় না ওরা। পেলে খেল, না পেলে খেলই না। কিন্তু হাঁড়িয়া চাই-ই চাই। হাঁড়িয়া খেয়ে মেয়ে-মরদে খেয়োখেয়ি কামড়া কামড়ি মারামারি খুনোখুনি—কি যে বা না করে! জন্তু জানোয়ারেরই মত। কি যে সুখ, কি যে অসুখ; সুন্দর কি, কুৎসিত যে কি; তা পর্যন্ত বোঝে না, জানে না এরা।

নইলে তার মা! আজ ভাবতেও তার মাথাটা নীচু হোয়ে যায়। সত্যই বলত বড়বাবুর স্ত্রী—জানোয়ারকেও শিখালে শিখে

কত। তোরা এত দেখেও শিখিসনে ; এত ভুগেও ভালো হোতে চেষ্টা নেই। মায়া লাগে আমার তোদের জন্যে।

কিন্তু কার মায়া, কিসের মায়া! বাবুরা তো সব ঘৃণা কোরেই খালাস্। নইলে তার মায়ের ব্যাপার! ছিঃ ছিঃ! উইলটনের কাকতি বাবুকে কত বলেছিল সে। কত কেঁদেছিল তার কাছে নবমী—তুয়াকে চৌকিদারঠু মানে খুব। বোলে দেনা মাকে ছাড়াই দিক।

ময় ইমান বেয়া কামতে নাই থাকিম্।—তাড়িয়ে দিল কাকতি নবমীকে।—তেঁও মানুহে জানোয়ার আছে ;তাত ময় কেলে যাম্!

ভাবতে পারে না নবমী—মা তার কি করল ; কি জঘণ্য ব্যাপার ঘটাল! কতগুলো বয়েস হয়েছিল, কতকাল এক সংগে ঘর করেছিল মা আর বাবা। সবাইর মূলে তো ঐ হাঁড়িয়া।

হাঁড়িয়া খেয়ে কি হোল। রাতভর দুজনে গালাগালি মারামারি কোরে কাটল। অন্য ঘরে একা একা শুয়ে শুয়ে শুনল নবমী। কিন্তু কী বা বলবে সে! আর করবেই বা কি! তার নিজের জীবনটাও তো বিষিয়ে গিয়েছে এই হাঁড়িয়ারই কারণে! অথচ হাঁড়িয়ার গন্ধ সইতে পারে না বোলে মা-বাবা তাকে গঞ্জনা কম করে নি। চাকরী থেকে ছাড়িয়ে পর্যন্ত নিয়ে এসেছিল। বাবু হোল সে, বাবুদের মাইকি হবে।—যা না তাই বলেছে তাকে—তারই বাপ মায়ে। যে কথা সব বলেছে সে সব কথা মনে ভাবাও পাপ, মুখে আনা তো যায়ই না। অথচ ব্যাপারটা কিছুই না, আত সামান্য। হাঁড়িয়া সে খেতে চায় নি, খেতে পারে নি। আড়াই বছর বাবুদের কাছে থেকে তার প্রবৃত্তিটা কেমন যেন একেবারে বদলে গিয়েছিল। ঐ হাঁড়িয়ার গন্ধটাই আর সইতে পারে না সে।

ছায়াছবির মত ভিড় কোরে আসে নবমীর সেই দিনগুলোর ঘটনা একটার পরে একটা।

তিন সপ্তাহ আসে নি সে বাড়িতে। বাবুর বাড়িতে অনেক লোকজন এসেছিল তাই। নইলে সপ্তাহে একদিন সন্ধ্যায় সে এসে রাত্রিটা থেকে চোলে যেত পরের দিন সকাল বেলা। এই ছুটিটা তার একরকম বাঁধাই ছিল। অবশ্য লোকজনের আসার জন্য তার ছুটি আটকায় নি। বাচ্ছাগুলোর খেলা দেয়া ছাড়া তো আর অন্য কায কিছু তার ছিল না! সে নিজেই যায় নি। এতগুলো ভদ্রলোক! বড় ভাল লাগছিল তার। কয়টা দিন ওখানে বেশ আনন্দে কেটে যাচ্ছিল। বড়বাবুর বোনটা তো আগেই তাকে দোস্ত পাতিয়ে নিয়েছিল!

কি চমৎকার মেয়ে! শুনেছে অনেক অনেক নাকি পড়েছে—ইয়া ভারি ভারি কেতাব! এখন নাকি পড়ায় বড় বড় পোড়ো মেয়েদের। কিন্তু কি চমৎকার মানুষটা! সে যে অত পড়েছে তার মুখ থেকে শোনে নি নবমী একবারও। তার ভাবী—বড়বাবুর গিন্নীর মুখে শুনেছিল সে।

প্রথমবারে এসেছিল সে এরও বেশ কিছুদিন আগে। ঢুকেই সে জানতে চায়—এ কে বৌদি?—গলাখানা কি মিষ্টি!...তোর নাম নবমী?—শুধালো তাকে। জড়সড়ো হোয়ে নবমী বলে—হাঁ!—চেহারাটার মধ্যে যেন কি আছে তার। দেখলেই যেন কেমন ভাল লাগে। ভয় নয়, তবু যেন কেমন মানী মানী লাগে তাকে। অথচ হাসির যেন ফোয়ারা মানুষটা।

ফিক কোরে হেসে বলে—বা-রে, নবমী কী রে নাম তোর!

পূর্ণিমা, তোর নাম পূর্ণিমা, জানলি ? আর আমায় কি ডাকবি ? বল তো ?—একটু ভেবে নেয় ; তারপর বলে—হাঁ, ডাকবি সখী—বুঝলি ? সখী মানে কি বল্ তো ?

অত মানেফানে। কেমন হোয়ে গেল নবমী। গলা শুকিয়ে কাঠ, ঢোক পর্যন্ত গিলতে পারে না, ভয়ে নয়; কিন্তু তবু যেন কি ? কেমন যেন জড়িয়ে আসে সর্বাংগ। ভয় হবে কেন ? অমন হাসি-খুসি চেহারা ! তবু—তবু—।

উত্তরের অপেক্ষা আর করে না সে, বলে—সখী মানে কী, জানিস না ? মানে—মানে দোস্ত। আমি তোর দোস্ত। জানলি ? নবমী কেবল মাথা নাড়ে।

বড়বাবুর স্ত্রী বলে—আহা, কী যে তোমার রসিকতা ? আমাদের ঝি—ছেলেদের রাখে।

আবার হাসে দোস্ত, দাঁতগুলোতে কি রোশনাই।—তা হোক। ও যদি নবমী, তবে আমরা যে প্রতিপদেও জায়গা পাব না, বৌদি। ও পূর্ণিমা। কেমন রে তোর পছন্দ আছে তো ?

এইবারে নবমীর গলায় শব্দ বেরুল—আছে।

—বাংলা বুঝিস তুই, বাংলা ?

উত্তর করে বৌদি—আ মোল ! এতদিন আছে আমার কাছে, তা বাংলা বুঝবে না ? কেন, তোমায় লিখেছিলাম তো, মনে নেই ওর কথা ?

—আরে তুমি লিখেছিলে ! খিল্‌খিল্ কোরে হাসে দোস্ত। তুমি যা লিখেছিলে, ও যে তার চাইতে অনেক সুন্দর, জানলে ! ওর রূপ কেমন উদার সরল স্বাভাবিক।—তুই যাবি পূর্ণিমা আমার

সংগে কলকাতা? পড়াব তোকে আমি পড়াব।—অন্য মনস্ক হোয়ে যায় সে। তারপর—নাঃ! কলকাতায় নয়; আমি এখানেই আরও আসব। তোকে পড়াব, জানলি ?

তারপর কি বলল দোস্ত কথাগুলো বড় ভারি ভারি। নবমীর সে সকল কথা মনে নেই, তেমন বোঝে নি। তবে তার মোটামুটি অর্থ কোরে নিয়েছিল নবমী—কলকাতায় মাটির মানুষগুলো পাথর হোয়ে যায়।

ছু-তিনবার এসেছিল দোস্ত। কত কথা হয়েছে কত ভাল ভাল আলাপ। যখন তখন হাঁক ডাক—পূর্ণিমা, এখানে আয়! দেখ তো, আমার মাথার শাদা চুল বার কোরে ফেল।—এই এই শাড়ীটা আজ পরব? কেমন রে শাড়ীখানা—মানাবে তো ?

আহা! একেবারে জহুরী মিলেছে তোমার!—ভাবী মুখ বাঁকা কোরে নেয়।

বল কি! ও যা বলবে না, সেটা একেবারে সরল সোজা, আর সেইটেই জানবে আসল সুন্দর।—আচ্ছা, তুই শাড়ী-ব্লাউজ বার কর্ তো পূর্ণিমা!

নবমী কারুর কোন কথার জবাব দিলে না। কেবল একটা হালকা সবুজ শাড়ী বেছে নিয়ে নাড়াচাড়া করে; টেনে বের করল ফিকে গোলাপী একটা ব্লাউজ। ছুটো নিয়ে নীরবে এগিয়ে দেয় দোস্তর সামনে। লাফিয়ে ওঠে দোস্ত—তবে নাকি পছন্দ নেই, বৌদি!

অবাক চোখে তাকিয়ে থাকে বৌদি—সত্যি তো!

—নে, এই ছুটো দিলুম তোকে। নে-নে, পোরে আয় তো দেখি।

....কি মানাবে ওকে, না বৌদি? পূর্ণিমার চাঁদের গায়ে শ্যামলের আবরণ, তাইতে, গোলাপী আস্তর! নিজে নিজেই বোলে গেল দোস্ত।...নে, যা পোরে আয়!

সমস্ত শরীরটা যেন কেমন তার জড়িয়ে যাচ্ছিল। হাত দু-খানা বাড়িয়ে দিল নবমী। থর্‌থর্ কোরে কাঁপছিল হাত দুখানি। কিছুতেই কাঁপুনি থামাতে পারে না সে।

ভয় কি রে! নে ধর।—হাতের উপরে শাড়ী ব্লাউজ রেখে নিজের হাতে তার হাত দিয়ে ধরিয়ে দিলে।

সমস্ত শরীরের মধ্য দিয়ে নবমীর কি ভীষণ একটা কাঁপন বোয়ে গেল! এমন কাঁপন বোধ করি পুরুষের প্রথম স্পর্শেও তার দেহে লাগে নি! কি যে আনন্দ কি যে ফূর্তি তার মনে খেলে গেল! সমস্ত বুকখানা তার যেন ঝড়ের মুখে ডিকম নদীর জলের মত কেঁপে কেঁপে ফুলে ফুলে উঠতে লাগল। ঘর থেকে বেরিয়ে এল; মনে হোল তার যেন বাতাসের উপর দিয়ে চলছে সে ভেসে।

আজও সর্বাংগ তার তেমনই কেবল কেঁপে কেঁপে উঠছে যে! আছে—সেই শাড়ী সেই ব্লাউজ ঐ বাক্সে তোলা। বছরে এক আধ দিন পরেও সে তা। কিন্তু দোস্তকে সে চিরদিনের জন্য হারিয়ে ফেলেছে। হায়! যদি আর একবার, একটি বারের জন্য সে দেখা পেত দোস্তর! এত আশা, এত আকাংখা, কিন্তু দেখা তার পাওয়ার আর কোন সুযোগ আজ নেই। কত কি তার আজ জানার ছিল। কত অস্পষ্টতা তাকে ব্যতিব্যস্ত কোরে তুলছে।

কিন্তু আনন্দ লোকের বরাবর একই রকম ভাবে চলে না। অত লোক এল সেবার বড়বাবুর বাড়িতে; দোস্তও এল। তিনটা

সপ্তাহ যেন উৎসবের আনন্দে ভোরে উঠেছিল। তিনটা সপ্তাহ কোথা দিয়ে কেটে গেল। উঠতে পূর্ণিমা, বসতে পূর্ণিমা, এটা কেমন রে, ওটা নিয়ে আয়। সর্বক্ষণ দোস্তর ফুট-ফরমাস। ছেলেমেয়েদের চাইতে তাদের পিসিকে নিয়েই কাটল তার দিন-রাত্রি।

নবমীর চোখ ছাপিয়ে এল জল। সমস্ত বুকটা যেন কিসের একটা হাহাকারে ফাঁকা হোয়ে গেল আজ। রিহার আঁচল দিয়ে মুছে নেয় চোখ রগড়ে রগড়ে। আজ কোথায় তার দোস্ত আর কোথায় বা সে! হারিয়ে গেল দোস্ত, ছিটকে এল সে আবার সেই অর্থহীন জীবনযাত্রার মাঝে। প্রাণ আছে, জীবন কই!

কেটে গেল তিনটা সপ্তাহ। দোস্ত চোলে গেল। যাওয়ার সময়ে একটা মোটা খাতা আর পেন্সিল দিল হাতে। খাতার পাতায় ইংরেজি আর বাংলা হরপ লিখে দিয়েছিল দোস্ত নিজ হাতে।—রোজ এই দেখে দেখে একপাতা কোরে লিখবি, এটা এক পাতা আর এটা এক পাতা। আবার যখন আসব, পড়া বোলে দেব।

আছে, খাতাখানা আজও আছে। পেন্সিল সেইটা ফুরিয়ে গিয়েছিল, আবার নূতন কিনেছে ক-টা সে।

ইংরেজি হরপ সে আগেই শিখেছিল। এখনও রোজই খাতা দেখে দেখে এক পাতা লেখে। মাঝে অবশ্য অনেক বছর বাদ গিয়েছিল। কিন্তু দোস্তর লেখাগুলো কি বাহারে! অমন সুন্দর তার কিছুতেই হয় না। বাংলা হরপ আর আয়ত্ত করার সুযোগ হয়নি। দমকা হাওয়ার আগে শুকনো পাতার মত ছিটকে উড়ে সোরে এসেছে সে উইলটন থেকে।

চোলে গেল দোস্ত, চোলে গেল আর সকলে। এইবারে সব ফাঁকা। মনে হোল মা-বাবার কথা। এর মধ্যে মা-বাবা অবশ্য একদিন দেখতে গিয়েছিল মেয়েটাকে উইলটনে।

হপ্তা শেষে এল বাড়িতে নবমী। পোরে এল সেই শাড়ী আর ব্লাউজ। চলার পথে মাঠের মাঝে গ্রামের লোকেরা সব চেয়ে চেয়ে দেখে—ভারি চিকনাই লেগেছে নবমীর!

—কাঁহা মিললেক রে?

—উথায় রে—বাবুর বুন দিলেক।

বাড়ি পোঁছল নবমী—তখন সন্ধ্যা নেমেছে। পূর্ণিমার চাঁদে পথ-ঘাঠ-মাঠ-গ্রাম ঝল্‌মল্‌ করছে। ঢুকতেই দাওয়ায় দেখা বুধরামের সংগে; সে বসেছিল একলা। মুখে গভীর হাসি নিয়ে এগিয়ে এল বুধরাম; বুকের আঁচলটা হাতে তুলে নিয়ে বলে—ভারি মিহিন রে নম্‌মী!

উঃ! মুখে কি গন্ধ! তবু হাসে নবমী। হেসে পাশ কাটিয়ে চোলে যায় ঘরের ভিতরে।

গন্ধ! হাঁ, বিশ্রী গন্ধই বটে। তবু এই তার পরিবেশ, এই তার সমাজ। আর বুধরাম? বুধরামকে আর ঘৃণা করার কী বা উপায় আছে! এতকাল তাকে ঘরে পুষে রেখেছিল বাপ এই বুধরামেরই খোঁজে। নইলে—

নইলে ছোট বেলা থেকে খেলেছে এক সংগে, কত ভাব-ভালবাসা ছিল সুন্দরের সংগে। সুন্দর! সুন্দর চেহারায় সুন্দর, আচার-আচরণে সুন্দর—একটা ভদ্র ভাব তার মধ্যে রয়েছে। নিজে ফরসা নবমী, তাই সুন্দরের গায়ের রংটাও ওরই মধ্যে ভালো লাগত

নবমীর। ফরসা ঠিক না হোলেও সুন্দর কালো নয়, তাতে গা-হাত-পা বেশ মাজা-ঘষা। ভালো লাগত নবমীর, ভালই বেসেছিল সুন্দরকে। কিন্তু মিলন তাদের হোতে পারে নি। সুন্দর তাদের জাত নয় সমাজের নয় মেল নয়। তার উপরে বাপের একমাত্র কন্যা, রূপসী কন্যা!

ভাবে নবমী বর্ণ শংকরেরও আবার সমাজ মেল! মানুষ কি সোজা সহজ ভাবে কোন কিছুই গ্রহণ করতে পারে না! হেসে ফেলে নবমী! ঐ তো মজা! সোজা পথ সামনে পোড়ে আছে, তবু দেখার বেলা চেষ্টা একটু বাঁকা কোরে; নয়তো অন্ততঃ সন্দেহের বাঁকা-চিন্তা দিয়ে পরিচ্ছন্নটাকে কলুষ-কালো কোরে নেবে মানুষে।

একমাত্র রূপসী কন্যা বাপের। অনেক আশা অনেক খাঁই রয়েছে তার। হাল পাবে, বয়েল পাবে। একটু রোয়েসোয়ে দেখেশুনে করলে চাই কি দুই চার হালসা মাটিও মিলতে পারে। তার উপরে ভালই হয়েছিল উইলটনের কামজারি। ভালই, ভালো জায়গায় রয়ে গেল নবমী। না জানিয়ে শুনিয়ে কারুর ঘরে সাইকি চোলে যাওয়ার ভয় তো নেই!

এইসব বলত তার বাপ-মা—শুনেছে সে নিজ কানে। আর ভয়ও বা কাকে! এক ঐ সুন্দর! আর কারুর সংগে মেয়েটা বড় কথাও বলে না। আসে বাড়িতে নবমী হপ্তায় একদিন, থাকে মাত্র একটা রাত্রি।

কিন্তু অত মাটি বয়েলের প্রত্যাশাই বা কার জন্য? ঐ একটাই তো মেয়ে! যা কিছু ওরই থাকবে ও-ই পাবে। আর মেল সমাজ

নিয়ে বা গোঁড়ামি অত কিসের! সমাজের আছে বা কি? আর কার জন্যই বা অত সমাজের দোহাই! ঐ মেয়েটাই তো একটা!

এল বুধরামের বাপ।—ছুকরিটাকে দিবি শম্ভু কাখে? না, পুষবি? ঘরেই রাখবি?

—নাই—ভালে কাঁহা মিলে? একেইটা তো ছুকরী!

—কেনে! হামার বুধরামকে লে খেনে?

লাফিয়ে পড়ে নবমীর বাপ। সে তো ভাগ্যি! বুধরামের বাপের পঁচিশ ত্রিশ পুরা নিজের চাষে মাটি। আট দশ জোড়া হাল গরু তার। ঘরে রোজ দুই সের তিন সের গরুর দুধ দুইয়ে পায়। হাল গরু এক জোড়া, সংগে তিন-চার কুড়ি টাকা তো মিলবেই। আবার খুসী যদি লাগে সুফলের—বুধরামের বাবার—চাই কি এক আধ হালসা মাটিও—। ভাবতে নবমীর বাপের কি সুখ।—মেয়েটাও খাবে পরবে ভালো।

লাফিয়ে ওঠে শম্ভু। কিন্তু তবু রেখে সেকে কথা কয়, গরজ দেখায় না। একটু চেপে না চললে কি পণটা তেমন ভালো আদায় হোতে পারে!

আবার সুফলেরও গরজ! বহুটা অমন সুরতিয়া হবে। সুফলের—মানে বুধরামের গরজ! বলে সে—মাইকিটা মেম-সায়েব তরে বগা হোতে লাগে। আর কী স্বাস্থ্য নবমীর! কিন্তু অমনি তো আর মিলবে না। ভালো জিনিসের দামও ভালো।

বাপকে ধোরে বসল বুধরাম। সুফলও দেখে মন্দ কি! নবমীর আর ভাই নেই বোন নেই। যা-ই দেবে সে পণ, তা-ই আবার নবমীর হাতে আসবে মানে বুধরামেরই হবে। আর ওরও

তো আছে দু-পুরা দু-হালসা মাটি। সে তো নবমীই পাবে। সুফল তাই সোজা প্রস্তাবটা একরকম নিজেই পারল।

দুইজনারই মত আছে—বাস! কথাবার্তা পাকা হোল তখনই। দু-হালসা মাটি এক জোড়া বয়েল আর চার কুড়ি সাত টাকা নগদ দেবে শ্বশুরকে বুধরাম। তবে বুধরামকে এক বছরটা ঘর-জামাই থাকতে হবে বিয়ের আগে। মেয়েটাকে পটাতে হবে তো! যা ফোঁস-ফোঁসানি মেয়ের! তা-বাদ শম্ভুরামের শরীরও কিছুদিন ভাল যাচ্ছে না। বলে শম্ভু—জানটা হামার ভাল নাই খে। ই বছরকে হাল গরু বুধরামকেই করতে লাগে।

বুধরাম তো এক পায়ে খাড়া। কথা সেই বিকেলেই পাকা হোল। এক কলসি হাঁড়িয়া বেরিয়ে এল দাওয়ায়। হাঁড়িয়ার কলসিটা ঘিরে বসে সুফল আর শম্ভুরাম, সম্বুন্দিটা পাকা কোরে ফেলল। সুফলের মাইকিকে ডাকা হোল, নবমীর মা এসে ভিড়ল। খুব হৈ-রৈ ঢলাঢলি হোয়ে পাকা হোয়ে গেল নবমী আর বুধরামের বিয়ে।

পরদিন ভোরে গিয়ে সংবাদটা পোঁছে এল নবমীকে শম্ভু। চুপ কোরে শুনলে নবমী খবরটা; বোধ করি মনে মনে খুসী হোতে পারে নি। বুধরাম বড় কালো। নইলে যোয়ান তাগড়া ছোকরা, সুন্দরের চাইতেও অনেক তাগড়া। তবু সুন্দর—!

কিন্তু নবমীর বলার বা আছে কি! বাপ-মায়ের বেসাতি বইতো আর কিছু নয় সে? অবশ্য বিয়ে যদি না করে। অমনি গিয়ে এখন থাকতে পারে যাকে পছন্দ, তার কাছে। বিয়ে পরে সুবিধামত হোলেই চলবে। কিন্তু না, তাতে বাপমায়ের পাওনাটা

নষ্ট হবে। দরকার কি? একমাত্র মেয়ে! কেন মিছে মা-বাবাকে দুঃখ দেবে!

বুধরাম চোলে এল ঘরজামাই। বছরটা থেকে শ্বশুরের মাটিটা কোরে দেবে। আবার গেল শম্ভু নবমীর কাছে। বুধরামকে সে কথা দিয়েছে। নবমী যেন এখন মাঝে মাঝে এসে ঘরে থাকে; অন্ততঃ রাতটা। নইলে বুধরাম আবার খোচে যাবে।

যাবে নবমী। সম্মতি দেয় সে। তা যেতে তো হবেই, নইলে বুধরামেরই বা মাটি করার সাধ কিসে! আর সে-ই বা তাতে আপত্তি করতে যাবে কেন? এ-তো তাদের সমাজে আক্‌ছার চোলেই থাকে। এতে দোষও নেই, খারাপও নয় কিছু। যাবে, যাবে না কেন? সংক্ষেপে বাপকে জানিয়ে দিয়েছিল নবমী। তবে যাবে সে দু-চারটা রোজ বাদে। এখন দোস্ত থাকতে ছাড়বে না তাকে, ছুটি হয় তো মিলবে না।

দেখতে দেখতে দিনগুলো কেটে গেল; নবমী এল বাড়িতে, পরণে সেই শাড়ী আর ব্লাউজ। পথে লোকের চোখে অবাক লাগে নবমীর রূপ দেখে। ভিতরে বাপ-মা আর শ্বশুর মিলে খুব চলছে। কাল রবিবার, দেওবারের মজা, কামজারি নেই।

শ্বশুর বলে—বহু, পি লে না কেনেক!

মা বলে—আ নম্‌মী।

বাপ আদর কোরে ডাকে—আব মাই!

কাপড়-জামা বদলে এল নবমী। মা বাড়িয়ে দিলে এক খুঁড়ি। ভক্ কোরে পচা ভাতের নির্যাসের গন্ধ লাগে নবমীর নাকে। উঃ! বিশ্রী গন্ধ! নাক তার জ্বলে যায়! আগেও সে

কেন যেন পছন্দ করত না জিনিসটা তেমন। এখন অভ্যাসটা একেবারে বদলে গেছে। হাত দিয়ে নিষেধ করে নবমী—খাবে না, নিয়ে যা।

কেনে রে?—শুধায় মা-বাপ-শ্বশুর।

—গন্ধায়, নাই খাব।

কি? গন্ধায়? বাবু হলেক, বাবুদের—অশ্রাব্য কথা উচ্চারণ করে মা।

আচ্ছা!—খুঁড়িটা তুলে নেয় নবমী।—চেষ্টা কোরে দেখে, আজ নয় তো কাল তো—। কিন্তু—ওয়াক্।—মুখের কাছে নিতেই উল্টে আসে। নাবিয়ে দিল খুঁড়িটা। ইসারায় বলে—লেই যা।

ক্ষেপে উঠ্‌ল মা; ক্ষেপে ওঠে বাপ। বিশ্রী বিশ্রী কথা সব বলতে সুরু করে। শ্বশুর হাঁকে—হেই রে বুধরাম। মাইকিটাকে তোর বনাই লে না রে!

কিন্তু নবমী করবে কি! চেষ্টা তো সে করলই!

বুধরাম এরও ভেতরে এসে আরও দু-খুঁড়ি তিন-খুঁড়ি খেয়ে গেছে। দাওয়ায় বোসে ভাজা বুটের চাষনি চিবুচ্ছিল। বেশ তখন ধরেছে তার আমেজ। লাফ্ দিয়ে চোলে আসে ঘরের ভেতরে। নবমীর দিকে একবার তাকাল কটমট কোরে। আর এক খুঁড়ি—ঐ নবমীরই রাখা খুঁড়িটা—তুলে মুখে ঢেলে নিল। হিংস্র জানোয়ারের মত লাফিয়ে পড়ে। ঝাপটে ধোরে পেড়ে ফেলল নবমীকে। ঠেসে ধরে তাকে, মুখের ভেতরকার সেই এক খুঁড়ি হাঁড়িয়া ঢেলে দিল নবমীর মুখে নাকে।

বাধা দিতে চেষ্টাও করে না নবমী। কারণ, নির্যাতন তবে

আরও বাড়বে। আর এই তো তাদের সমাজজীবন। এরই মধ্যে তো ফিরে আসতে হবে ; খেতেই তো হবে এই সব একদিন। কিন্তু পারে না যে নবমী! একি হোল তার! পেটের নাড়ি-ভুঁড়ি পর্যন্ত যেন ঠেলে বেরিয়ে আসতে চায়। বমি বুঝি হোয়েই যাবে! প্রাণপণে চেষ্টা করে চাপতে। লড়াইতে বমি হয় তো আটকাল ; কিন্তু চোখ জ্বালা কোরে যেন ফেটে যেতে চায়, বুঝি চোখের মণিটাই ঠিকরে বেরিয়ে আসবে! ঝর্-ঝর্ কোরে চোখ ছাপিয়ে বেরিয়ে এল জল। …ও—ও—ওয়াক্, বড় কষ্ট লাগে। মুখ ফিরিয়ে নেয় নবমী। চোখের উপরে বুধরামের মুখটা যেন বিভীষিকা!

কাঁনছে য্যা!—বুধরাম কাঁপতে কাঁপতে সোবে দাঁড়ায়।

কেন যেন বুধরামকে ভালো লাগল, অন্ততঃ সেই মুহূর্তে। লোকটার মধ্যে তবে মানুষ তো একটা আছে!

কিন্তু ক্ষেপে ওঠে মা, গোর্জে উঠল বাপ।

শ্বশুর বলে—ছোড়ে দে—হো—য়ে যাবেক—নাই তো ল্যাটরা করবেক র‍্যাঁ!

শ্বশুরকেও বড় ভালো লাগে নবমীর। বেশ কথা বললে তো!

বুধরাম ফিরে যাচ্ছিল। লাফিয়ে উঠে এসে ঝপ্ কোরে হাত ধরে শাশুড়ী—নবমীর মা। তার তখন সর্বাংগ নেশার ঘোরে টাল খাচ্ছে।—হে-এ-ই রে মরদ, মাই-ই-কি রাখবে! লে—লেই যা বু-দ্ধু, আপন ঘরে—ল্-লিয়ে-য়ে—আর কিছু বিশেষ বলতে পারলে না। কিন্তু সে যে কি ভীষণ বিশ্রী একটা ভংগী কোরে বললে—বা-বানাই লে ছোক—হুঁক্-রা!

নবমীর চোখের সামনে আজ দোস্তর মুখখানা ভেসে ওঠে। এই সমাজের মানুষ হোয়েও সেই ভংগীটার দিকে তাকাতে পারলে না নবমী। তার মা মেয়েমানুষ; দোস্তও মেয়েমানুষ। কিন্তু সেই মুখ! আঃ! বিশ্বের মধু, রাজ্যের ভব্যতা যেন ছড়িয়ে পড়ে সে মুখে। চোখ বোজে নবমী।

বাপ হাত ধোরে টেনে তোলে।—হাঁ, লেই যা।—বোলে ঐ মায়েরই মত অংগ ভংগী কোরে বলে—হাঁ—আঁ—আঁ বনাই লে শা-শালীকে।

ছিঃ ছিঃ! নবমীর কাছে বাপের মুখে মেয়েকে এমন কথা কেমন ঘেন্নার শোনাচ্ছিল। নবমীর কাছে এমনটা অনেক দিন হয় বর্বরতা হোয়ে উঠেছে—আড়াই বছরের পরিবেশের প্রভাবে।

আর ছি ছি। মায়েতে বাপেতে নবমী আর বুধরামকে ঠেলে নিয়ে একটা ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে টেনে দিল দরজাটা। বাইরে থেকে মা জড়ানো জড়ানো কথায় যেই ভাষা উচ্চারণ করলে নবমী আড়াই বছর সেই শব্দগুলিই শোনে নি। কথাগুলোর আনু-ষংগিক ভাব-ভংগী মার তবু তো দেখতে পাচ্ছিল না নবমী। তার আজ বার বার দোস্তর মুখখানা মনে পড়ে; বিশ্বের লজ্জা এসে তাকে মুহ্যমান কোরে ফেলে—কেমন যেন অংগ-প্রত্যংগ তার জড়-স্থবির হোয়ে পড়ল। বুঝি মুখখানা তার লাল হোয়ে উঠেছিল, বুঝি রূপ তার আরও ফেটে পড়ছিল। মাতাল বুধরাম শাশুড়ীর কথায় আরও উন্মত্ত হোয়ে ওঠে; মনের সমস্ত লালসা চোখের তারায় ঝিক্-মিক্ কোরে ওঠে তার। সেই মিটমিটে আলোতেও দেখতে পায় নবমী বুধরামের চোখে উন্মত্ততা ধক্‌ধক্

করে। আঃ! কী বীভৎস কুৎসিত ব্যাপার! অংগ সৌষ্ঠবের দেহ-মন্দিরের কি অবমাননা! নইলে—

—ইমান্ সুরতিয়া তু!—ঝাঁপিয়ে পড়ে যেন বুধরাম। উঃ সে কি বেদনাদায়ক উৎপীড়ন।

আজ বোসে বোসে ভাবছে নবমী গত দিনগুলির কথা। ভাবছিল তাদের এই বিকৃত সমাজের কথা। দুর্গত সমাজ তাদের। বড় বেদনা বোধ করে। কেউ কি পারে না এদের মানুষ কোরে তুলতে! মানুষের মত এরা বাঁচতে পারে এমন কি কেউ করতে পারে না! জাতির অংগে এই রোগগ্রস্ত জনগোষ্ঠী ক্ষত বই তো কিছু নয়!

এত বড় কথা কোথা থেকে জানল নবমী? কে শেখালে? জানে না তো! কিন্তু সত্যই কথাগুলো ভেবে নবমী আকুল হোয়ে ওঠে! কে দেখাবে তাকে আজ পথ!

নইলে বিয়ে না হোলেও পুরুষের সংগে বাস করা নবমীদের সমাজে নূতন নয়, খারাপ বা অন্যায়ও নয়। ঐ তো মংগলার ছেলেটা। মংগলা গরীব—হাল-গরু আর তিন কুড়ি সাত টাকা পণ দিতে পারেনি ছেলেটা। নিয়ে এল নিজের ঘরে মেয়েটাকে। মেয়ের বাপ রেগে আগুন। বসল পঞ্চায়েত। মেয়েটা সোজা বোলে দিল—হামি আপনসে আইলাম।

ছোকরা বললে—হামার নাই না কিছু, কি-ই দিবি।

মিটে গেল। পঞ্চায়েতের আর কিছু বলার নেই। মেয়েটা নিজে এল তো! এই সকল টানা-পড়েন করতে করতে বছর প্রায় ঘুরে গেল। একটা বাচ্ছাও হোল। তারপর মংগলা একদিন

ঘটা কোরে—অবশ্য তার সামর্থ্য মত—ছেলে বৌয়ের বিয়েটা করিয়ে দিলে।

ওতে দোষ নেই। এ তাদের সমাজে আক্ছার চলছে। বিয়ে করা স্ত্রীলোক ভাগিয়ে এনে কত বিয়ে করে। কেবল আগেকার পুরুষকে মিটিয়ে দিতে হয় খরচ-বরচ যা হয়েছে তার বিয়ের বাবদ আর স্ত্রীলোকটিকে খাওয়াতে পরাতে। নইলে আর কোন বাধা নেই। অবশ্য টাকাকড়ি না দিলে এইখানে মারামারি খুনোখুনি হোয়ে যায়। কিন্তু অচল তো নয়! দোষও নেই কিছু। আর বুধরাম তো তারই কারণে এইখানে। কথা পাকা। দেনা-পাওনা পাকা। কাজেই এসব অধিকার তার বর্তে গেছে। তবু নবমীর আদতটা ভাল লাগছিল না। কেমন কেমন যেন সব মনে হচ্ছিল।

ভোরে ঘুম ভাংগতে দেরী হোল। বেলা হোয়ে গেছে অনেকটা। সমস্ত মনটা ফাঁকা, দেহটা যেন কেমন ভারী, অসার হোয়ে গেছে। দেহটাকে টেনে তুলতে হয় নবমীর; সর্বাংগে যেন বেদনা ধোরে গেছে। চোখটা পর্যন্ত জ্বালা করছিল। তবু টেনে তোলে নবমী নিজেকে। তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুয়ে কাপড় পরে, তৈরী হোয়ে নিল সে। —উঃ উইলটনে যেতে অনেক দেরী হোয়ে গেল।

বেরুতে যাবে, দাওয়ায় বোসে শম্ভু।—নাই যাবি কামজারি। হামি বোলে আইলি। হেই তুয়ার দরমাহা। আর হেই দশঠু টকা—কি বল্লেক বড়বাবুর মাইকিটা। কি-ই বল্লেক—সাদিতে সাদিতে—কি জানি, ভুলাই গেলি। হামি বল্লি যে তুয়ার সাদি

পাকা, আর কামজারি নাই যাবি। —এক নিঃশ্বাসে বোলে শেষ করে শম্ভু তার বক্তব্য।

মনটা বড় খারাপ হোয়ে গেল নবমীর। যা-ই চাইছে তাই তো সে কোরে যাচ্ছে নির্বিবাদে। কেবল হাঁড়িয়া! তা-ও সে চেষ্টার ক্রুটী করেনি। ভেতর থেকে—যাতে সায় নেই, তা কি অমন একদিনে পারে আয়ত্ত করতে! সে-ও হয় তো চেষ্টা করতে করতে পারবে একদিন। কিন্তু এত তাড়া কি ছিল! বিয়ের তো এখনও এক বছর বাকী। এখনই কাযটা ছেড়ে দেয়ার দরকার তো ছিল না কিছু। বড় রাগ হোল নবমীর। মাইনের টাকাটা হাতে নিয়ে, আর টাকাটা বাপের পায়ের কাছে ফেলে দিয়ে ধপ্ ধপ্ কোরে পা ফেলে চোলে গেল ঘরের ভেতরে।

বাপ মহাখুসী। টাকাটা তুলে নিয়ে সে রওনা হোল ডিব্রু-গড়ের দিকে। ভালোই হোল। হাঁড়িয়া খেয়ে খেয়ে মুখ পোচে গেছে। ওটা ওর খুব পছন্দও নয়। জোটে না অন্য কিছু, তাই খায়। নইলে পয়সা হোলে ভাটির মদ……আঃ! কি সোয়াদি! তার গন্ধটাও এমন বিশ্রী নয়। টাকা ক-টা মোফত! ভালোই হোল। টাকাটা আঁচলে বেঁধে লম্বা লম্বা পা ফেলে চোলে গেল শম্ভু। নবমী ঘর থেকে দেখল তাকে।

সেই থেকে নবমী ফিরে এসেছে আবার ভাজনী গাঁয়ে। এসেছে তাদের নিজেদের সমাজের মধ্যে—চিরদিনের পরিবেশে। প্রায়ই মনে পড়ে তার উইলটনের বড়বাবুর স্ত্রীকে, বাচ্চাগুলোকে। তারা এখন কত বড় হোয়ে গেছে! মনে পড়ে দোস্তকে—সব চাইতে বেশি। আজও এই দীর্ঘ বারো বছর পরে তার মুখখানাই বারবার

ভেসে উঠছে ; তার কথাগুলোই বারবার বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে আসছে।

পারবি নে পূর্ণিমা তোদের মানুষগুলোকে ভদ্র ভালো কোরে তুলতে ? আমি শিখিয়ে দেব তোকে—ভালো কি, মন্দ বা কি। নিয়ে যাবি আমাকে তোদের গাঁওয়ে ? কিন্তু এতবার এল-গেল দোস্ত ঐ আড়াই বছরের মধ্যে—উইলটন আর কলকাতা, কিছুতেই সময় হোয়ে উঠল না দোস্তকে গাঁয়ে তাদের নিয়ে আসার।

যৌবনেই তার আজ মধ্য-জীবনের দুর্ভাবনা। আর তো সময় নেই ! কিছু করতে হোলে আর অপেক্ষা করা চলে না। কিন্তু করে কি সে ! কিছুই তো জানে না দুনিয়ার। কেবল মর্মে মর্মে অনুভব করছে—কোথায় যেন গলদ। কোথায় যেন জোমে উঠেছে ক্লেদ এই আরজালা-আগাছার মত চা-বাগিচার কুলি সমাজের মধ্যে। চাই শক্ত লোকের ভালবাসনিয়া দরদ ; চাই যত্ন আর আন্তরিকতা। সে ? সে পারে না কি ? হাঁ, পারে সে এ নিয়ে একটা ঝড় তুলতে। তারপর ? কি করলে ঝড় থামবে কি হোলে সকলের ভালো হবে এসব তো জানা নেই তার। যদি দোস্তর সন্ধান পেত সে এখন একবার ! তার দুটি পায়ে ধোরে জেনে নিত কি হোলে ভালো হয় এই দুর্গত সমাজের। দোস্তর চোখে দেখেছিল সে আলো, মুখে দেখেছিল মানুষকে ভালোবাসার মাধুর্য্য। কিন্তু—

কিন্তু সেইদিন থেকে উইলটন্ আর যেতে পারে নি। কেমন যেন পা জড়িয়ে যাচ্ছিল লজ্জায়। বলা নেই কওয়া নেই—সাদি। তারপরে [illegible] পর্যন্ত সরম তার কাটেনি। একদিন শেষে চমক ভাংলো ; বুঝল এই জীবনের সবকিছু সাধ-আহ্লাদ নিঃশেষ

হোয়ে গেছে। কেবলই বেদনা বাজে তাদের এই নির্যাতিত-ঘৃণিত-সমাজের জন্য। সেইদিন বুঝতে পারল—চাই আলো, আলো প্রচুর আলো।

কিন্তু কোথায় পাবে সে আলো, কোথায় আলোর সন্ধান! বহুকাল পরে সেইদিন কে যেন ঠেলে নিয়ে গিয়েছিল তাকে উইলটনে। নেই দোস্ত নেই। বড়বাবু নেই। পেন্সন হোয়ে গেছে তার। কোথায় থাকে এখন কেউ পাতা দিতে পারেনি। নবমীর বুকের মধ্যে যেন বাতাস বন্ধ-করা হাঁপর চলছিল। গেল, তার সবই গেল। গায়ে জ্বালা ধরে তার—এলি তো দশটা বছর আগে আসতে কি ছিল! অন্ধকার! চারিদিক অন্ধকার তার। একমাত্র আশার আলো ছিল যেটা দূরাগত তাও তার বুঝি হারিয়ে গেল। আর—

আর আবার কি! পায়ে পায়ে মাতালের মত টলতে টলতে এল সে ফিরে ভাজনী গাঁয়ে—সেই নির্জন নিঃসংগ ঘরে, একাকী জীবনের একান্ত বেদনাময় পরিবেশে। এইখানে তার নারীত্ব দিয়েছিল বুধরামকে। এই ঘরে তার জন্ম। এই ঘরে বাস করেছিল তার মা আর বাবু। এই আংগিনায় খেলা করেছিল নবমী বাল্যে। এই পরিবেশে পরিপুষ্ট হোয়ে উঠেছে তার যৌবন-কল্পনা-বিলাস-সুখ। বুঝি এইখানেই হবে তার জীবনের শেষ! শিউরে ওঠে নবমী। না-না-না—!

মনে পড়ে নবমীর বিয়ের দিনের কথা। হলুদে ছোপানো শাড়ী পোরে ভীড় করল কতগুলি মেয়েমানুষে। ছোপানো কাপড় দিয়ে ঢেকে নিয়েছিল সবাই একএকটা ঝুড়িতে চাল, দই,

চিড়া নানা রকমের সামগ্রী। এল সব বুধরামের ঘর থেকে কাসা গাঁও থেকে। নবমী হলুদে ছোপানো কাপড় পোরে চোলে গেল তাদের সংগে বুধরামের ঘরে। তারপর এটা-ওটা-সেটা কত মেয়েলি আচার। মনেও পড়ে না অত সব আর এখন। কি সব তিলক-ফিলক—আরও সব কত কিছু। তিলকের কয়দিন পরে বিয়ে হয়েছিল তার মনে নেই। বিয়ের দিন—মন্তর-তন্তর কত রকম। দিনটা ঐসব নিয়ে কেটে গেল। সন্ধ্যার পরে খাওয়া-দাওয়া। খাওয়া দাওয়া যেমন তেমন, আবার সেই হাঁড়িয়া। সারা বাড়িময় হাঁড়িয়ার গন্ধে নাক জ্বলে যাচ্ছিল। তবে সেইদিন আর তাকে খাবার জন্য কেউ পীড়াপীড়ি মারামারি করেনি। এখনও সে ঐ জিনিসটা বরদাস্ত করতে পারে না। মনে পড়ে সেইদিন থেকে হাঁড়িয়া খাওয়া নিয়ে বুধরামও আর ধস্তাধস্তি তেমন বেশি করেনি। কিন্তু তার আগে একটা বছর! ভাবতেও পারে না নবমী।

একটা বছর কেটেছে বিয়ের আগে বুধরামের সংগে তাদেরই বাড়িতে। কী পীড়ন করেছে বুধরাম হাঁড়িয়া খাওয়া নিয়ে। এক এক দিন ঘরে বন্ধ কোরে গায়ে কাপড়জামাতে ঢেলে দিয়েছে হাঁড়িয়া।—গন্ধায়! ফুট্‌টানি!—ঢেলে দিয়ে উন্মত্তভাবে উৎপীড়ন অত্যাচার করেছে তার দেহটাকে নিয়ে, যেন দেহটার তার আর অন্য কোন দাম নেই; দেহটা যেন তার একটা মাংসপিণ্ড বই আর কিছু নয়। ইচ্ছা অনিচ্ছা বোলে তার নিজস্ব কিছু থাকত না, যেন থাকতে নেই। বুধরামের ইচ্ছাই যেন তার ইচ্ছা! তবু নবমী সব সোয়ে এসেছিল, সব কিছুই মেনে নিয়েছিল। তবু,

তবু কিন্তু শেষ পর্যন্ত নবমীর দাম্পত্য জীবনের অবসানের কারণ হোয়ে উঠল ঐ হাঁড়িয়া।

যাক্, তার জন্য তার কোন আপসোস নেই। হা-হুতাশ করে নি কোন দিন নবমী। নারী পুরুষের সম্পর্ক যেখানে এত পলকা এমন ঠুন্‌কো, সেইখানে নর-নারী সম্পর্কটা না-ই থাকা বোধ করি ভালো। আর কী দেখে এসেছিল উইলটনে সে দাম্পত্য জীবন—বড়বাবু আর তার স্ত্রীর মধ্যে! কি পরিপূর্ণ! কি মধুর! যেন দুইটি প্রাণ এক, মন যেন বিভেদশূন্য। দুজনকে দুজন যেন একটুও বুঝতে ভুল করে না, দুজনকে দুজন যেন সুখী করতে ব্যস্ত। আঃ! ভাবতেও শান্তি! তার আর বুধরামের নারীপুরুষ সম্পর্ক!

বুধরামের জন্য তার মমতাও আর নেই আজ অন্তরে অবশেষ! পশুত্বকে আর মেনে নিতে পারে নি নবমী। বুধরামের তো কাম আর কামনাটাই প্রধান; মানুষের সংগে মানুষের যে সম্বন্ধ তার ধার সে ধারে না। অবশ্য একেবারে কখনও কোনদিন বায়েকের জন্যও ধারেনি এমন নবমী বলতে পারে না। কচিৎ কখনও ভিতরের মানুষটা তার সাড়া দিয়েছে; তবে তা একেবারেই নেহাৎ মুহূর্তের জন্য। অমন মানুষ নিয়ে জীবন কাটান যায় না। চায়ও না সে আর অমন সংগ অমন জীবন। হাঁ, তবে—!

বুকটা টন্ টন্ কোরে ওঠে নবমীর ছেলেটা আর মেয়েটার জন্য। দিলে না বুধরাম তাকে ছেলেমেয়ে দুটো। লোকের কাছে শোনে নবমী যত্ন নাকি হয় না তেমন ছেলেমেয়ের। বুধরাম বলে সে তো তাড়ায় নি নবমীকে!

বলে—সাদি করলি, মাইকি থাকুক ঘরকে। মানা নাই না করছি। হামার অথ মেমসায়েবি পুষাই নাই। হামার দুসরা বন্দোবস্ত লিয়ে হামি থাকব।

বাপ্! সেই মাইকিটার কি তেজ! মারতে আসে নবমীকে। আর অমন পুরুষের ঘর করা সম্ভব নয় তার। কিন্তু ছেলেটা-মেয়েটা—

নবমীর মনটা এবার নেবে এলো একেবারে তার নিজের কাছে। সমাজ, দুর্গত অর্ধ-বর্বর কুলি সমাজের অস্তিত্ব আর রইল না তার সামনে; মূল্য ঐ সমাজের কিছু নেই। সমাজ! অন্যায়কে প্রশ্রয় দেয়, ভালমন্দ বিচার করে না, তাই আবার মানুষ; মানুষের সমাজ! কিন্তু সন্তান দুটো তার! ছেলেমেয়ে দুটোকে সে পেটে ধরেছিল, লালন করেছিল, মানুষ কোরে তুলেছিল। সেখানে তো তার ফাঁক বা ফাঁকি ছিল না! দোস্ত কথায় কথায় বলত—আছে রে ভগবান, আছে। মানুষের মনের জোরটাই ভগবান।

কিন্তু কই! সে মা। সন্তানের প্রতি মায়ের স্নেহ। সেখানে কি মনের জোর কম ছিল, না থাকতে পারে! তার একান্ত কামনা ছিল—ছেলেমেয়েদের এই পরিবেশ থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে মানুষ কোরে তুলবে। পারবে, পারবে সে! সেই সাহস, সেই মনের জোর তার এখনও আছে, আজও আছে। আজ এই মুহূর্তে পেলে সে ওদের নিয়ে পালিয়ে চোলে যেত এই শ্বাসবদ্ধ করা সমাজ-গণ্ডীর বাইরে—প্রচুর আলো বাতাস যেখানে আছে। কিন্তু তারও বা আর ভরসা কোথায়!

বুধরামকে কত বুঝিয়েছে—তুয়ারই হামি, হামার বাপের মাটিঠ্ আগলাবো আর মানুষ করব ছানা দুটোকে। তুয়ার ছানা তুয়ারই

থাকবেক। উল্টে ওরা মাইকি-মোটাতে লাঠি নিয়ে মারতে আসে — চালাকি হচ্ছেন!

কাসাগাঁওয়ের জনে-জনেকে বলেছে, গাঁও-বুড়াকে বলেছে— ছেলেমেয়ে দুটোকে আমায় এনে দাও! গাঁও-বুড়ার পায়ে ধরেছে। কই, কেউ কিছু করে নি। দোস্ত বলত—আবার শয়তানটাও এই মনেই আছে রে পূর্ণিমা!

ঠিক কথা! তবে ওদের শয়তানটাই পাকড়েছে জবর। তবু সে আশা ছাড়ে নি। আজও তাই বোসে আছে এইখানে বাপের এই ভিটাতে। ঐ এক আশা, যদি—।

নইলে কে বোসে থাকত এই লক্ষ্মীছাড়া ভিটেতে। এই ভিটে? ছিঃ ছিঃ! কি কুৎসিত ব্যাপার! কে জানে বাপের এখন কি অবস্থা! বুড়ো বাপ! ভালো হোক, মন্দ হোক, জেল তো জানত না বাপ কোনোদিন। শিউরে ওঠে নবমী।

শুনেছে জেলে নাকি মানুষকে দিয়ে ঘানি ঘুরায়—গরুর কায করায় মানুষকে দিয়ে। এই তো মানুষের জীবন! কি তুচ্ছ ব্যাপারের কী-বা পরিণতি!

মনটা নবমীর ঘেন্নায় ভোরে ওঠে। মা হোলে কি হবে! বাবা তার হাঁড়িয়া খুব খেতে চায় না। গন্ধটা নাকি তারও তেমন ভালো লাগে না। তা না-ই লাগল! সে দোষের কি! সবারই তো সব জিনিস ভালো লাগে না! মার তো আবার ভাটির মদটা তেমন পছন্দসই নয়। তা আর এই একটা সামান্য বিষয় নিয়ে এতকাল পরে ঘর ভাংগাভাংগি।

মেয়ে শ্বশুর ঘরে যাওয়ার পরে মায়ের বড় বাড়াবাড়ি সুরু

হোল। প্রায়ই তার হাঁড়িয়া লাগে। অথচ রোজ রোজ অমন হাঁড়িয়ার যোগান দিতে বাপের অত সংগতি কোথায়! এদিকে হাঁড়িয়া না খাওয়ার দরুণ বুধরাম তং করে নবমীকে। মারধোরও না করে এমন নয়—অত কি মেমসায়েবি! বাপ শুনে শুনে যেন কেমন বিতৃষ্ণা বোধ করে হাঁড়িয়ার উপরে। তবু মায়ের পীড়াপীড়িতে খেত; হাঁ, খেত বই কি!

শম্ভু সেবারে এক ঠিকাদারের কায কোরে থোকে কটা টাকা পেল। সহর থেকে কিনে আনে দু বোতল ভাটির মদ।—পিয়ে লে, দেখ কি মজার বয় নিকলে।—বলে স্ত্রীকে।

নবমীর মায়ের পছন্দ নাই।—বড় হালকা বাস নিকলায়, নাই লাগে মজা। হাঁড়িয়ার খুঁড়ি এগিয়ে দেয়—লে, অত নবাবি কেনেকে? নেশার মাঝে চলে কথা কাটাকাটি প্রথমে, শেষে মারামারি পর্যন্ত।

দুপুর রাত্রি। মা হাঁকে—সম্বুন্দি, হেই সম্বুন্দি!

নবমীর শ্বশুর বেরিয়ে আসে বাইরে। তারও তখন পা টলছে। নেশার ঝোঁক। কি আলাপ হোল ওদের। দু-জন ঢোকে একই ঘরে। রাত্রিভর সেই ঘরে হাসাহাসি—ঘরে শুয়ে শুয়ে শোনে নবমী। কি যে হোচ্ছে? শাশুড়ী নিজের ঘরে অনেক অত্যাচারের পরে নেশার ঘোরে পোড়ে পোড়ে ঘুমুচ্ছে।

রাত্রি গেল, ভোর হোল। বেলা বাড়ে। শ্বশুর আর মা তখনও সেই একই ঘরে। বোধকরি তখনও ঘুম ভাংগেনি বা নেশা কাটেনি। শাশুড়ী চোটে আগুন। ছিঃ! ছিঃ! ছিঃ! লজ্জায় নবমী যেন মাথা তুলতে পারছিল না।

ছেলেকে হুকুম করে শ্বাশুড়ী—দরজা ভাং, বুধরাম ; ঘুসে যা ঘরেকে।

নির্লজ্জ জামাই শ্বাশুড়ীকে টেনে বার কোরে আনে ঘর থেকে। মা গিয়ে টেনে বার কোরে আনে বুধরামের বাপকে। তারপর কুরুক্ষেত্র ঘটে গেল বাড়িটাতে—মারধোর, গালাগালি। ভাষা অশ্রাব্য। সেই ব্যাপারটা মনে পোড়ে আজও নবমী যেন মাটির সাথে মিশে যায় একেবারে। সেই থেকে মা তার যেন কেমন ক্ষেপে গেল।

প্রায়ই মায়েতে বাপেতে মারামারি, খুনোখুনি চোলেই থাকে। কী যে তার কারণ, কী যে বিষয় আজও জানে না নবমী। তবে অনুমান করে—ঐ হাঁড়িয়াই হবে কারণ। ঐ তো এই সমাজের ভাংগানিয়া গড়ানিয়া উপাদান। হাঁড়িয়ার সূত্র ধোরে কত সংসার ওদের ছারখার হোয়ে যায়, কত ঘর ভেংগে ভেসে চোলে যায়।

তার নিজেরই বা কি ? নিজের ঘর, নিজের সংসার, ছেলেমেয়ে সব ছেড়ে দিয়ে আসতে হয়েছে তার ; বাপের ঘরে নিঃসংগ একাকী বেদনাভরা দিন কাটিয়ে চলেছে।

সে প্রতিবাদ করত না, যা কিছু নীরবে সহ্য করেছে, নিজে সোয়ে নিয়েছে, সোরে গিয়েছে। নইলে মারামারি খেউড় সবই তার সংসারেও ঘটে যেত। হাঁড়িয়ার দরুণ মার তাকেও খেতে হোত। অত মেমসাহেবি বুধরাম কিছুতেই সহ্য করবে না। আবার নবমীর পক্ষেও হাঁড়িয়া বরদাস্ত করা সম্ভব হয় নি। শত চেষ্টা কোরেও সে হাঁড়িয়াতে অভ্যাস করতে পারে নি। মার খেয়েছে বিনা প্রতিবাদে

তখন বুধরামের হাতে। শেষে লালসার পরিতৃপ্তি কোরে তবে নবমী বুধরামকে শান্ত করত।

এই উপায়টা নবমীর হঠাৎ আবিষ্কার। তাই শেষে মার খেত কম। একটা অবস্থা তার জানা হোয়ে গেল। সেই অবস্থায় পোঁছলেই নবমী ঔষধ প্রয়োগ করত। যদৃচ্ছা অত্যাচারের পরে আপনি হোতেই অবসাদে বুধরাম ঘুমিয়ে পড়ত। আজও সেই মুহূর্ত-গুলির কথা মনে পড়লে নবমীর হাসি পায়, বেদনা বোধ করে। কী পশু-চরিত্র মানুষের! কিন্তু এমনভাবে নিজের দেহমনকে নির্যাতিত কোরেও ভাগ্য তার ফিরল না।

সাময়িক উত্তেজনা নবমী দেহের বিনিময়ে শান্ত করত বটে; কিন্তু বুধরামের মন যেন অন্য কি খুঁজে পায় নি। একদিন মহা গোলমাল পোড়ে গেল কাসার্গাঁওয়ে। সুন্দরের মাইকিকে বুধরাম ভাগিয়ে নিয়ে এসেছে।

সুন্দর ক্ষেপে গেল।—লেবে, লাও। কেনে—হামার অনেক খরচ-বরচ হোল উয়ার কারণে। দেই দাও সেই সব টাকা-কড়ি, মাইকি লাও।

কেন, সুন্দরের ঘরে দোষ কি? দোষ অনেক। সুন্দর কানি খায়। হাঁড়িয়া মোটে সে চোঁবে না। মাইকির আবার হাঁড়িয়া নইলে নয়। দেড় মাস যখন তার বয়স, তখন থেকে মা-বাবা তার তাকে হাঁড়িয়া ধরিয়েছে। আজ আর তার ও ছাড়া কি চলে?

সত্যই তো। মায়ের দুধের সংগে সংগে যেই অভ্যাসটা পাকা কোরে তুলেছে, তা-ও কি এখন আর ছাড়া যায়! সত্যই তো! অভ্যাসটা যখন হোয়েই গেছে! সুন্দর ওতে আপত্তি করে

না ; বলে—তু খা না ! হামি কুন্থ কালে নাই খালি, হামার নাই লাগে ভাল্।—টগরিয়া খাবে খাক্ ; সব যোগাড় কোরে দেয় সুন্দর। কিন্তু সে খেতে পারত না, খেত না। অথচ আজ নাকি সেই সুন্দর হাঁড়িয়াতেই ডুবে থাকে—শুনতে পায় নবমী লোকের মুখে।

বেদনা বোধ করে নবমী সুন্দরের জন্য। কানি মানে আফিং খেত সুন্দর। কিন্তু মানুষটা সুন্দর আর অন্য দিক থেকে ভালই বলতে হবে। তারও অদৃষ্ট। শিশুকাল থেকেই বাবা-মা তাকে কানি ধরিয়েছিল। মা-বাবা তার চোলে গেল অনেক দিন ; কিন্তু কানির অভ্যেসটা তার রোয়ে গেল সংগী হোয়ে। মাটি বলদ গরু সুন্দরের ভালো ক্ষেতি খামার। তার উপরে উইলটনে ফালতু-মজুরের খাতায় তার নাম উঠে আছে ; সেখানে কায তার বাঁধা। মজদুর ইউনিয়নেও সে আসন পেয়ে আসছে। ক্ষমতাবান লোক সে নিঃসন্দেহ। কানির খরচ একটু বেশি। কিন্তু তবু তার মাপ আছে ; আর সে খরচ করার সংগতিও আছে তার।

ঘরে গোলমাল, বাইরে গোলমাল, গাঁওয়ে একটা হৈ-চৈ পোড়ে গেল।

—হুঁঃ, একলা জমে হাঁড়িয়া, বিনা সাথী এ !—গাল ফুলিয়ে মাথা ঝেঁকে বলে টগরিয়া।—ধেৎ !—বলে তু খা না কেনে ? দরদ দেখাইছে ! ধুৎ ধুৎ ধুৎ !

সুন্দর মারমুখো। টাকা দাও, মাইকি নাও। নয় তো খুন হোয়ে যাবে।

—কী-ই ভাজনীর মানুষে কাসা পাথারে করবেক খুন !—ক্ষেপে গেল কাসাগাঁওয়ের ছোকরাগুলো।—নাই দিবি মাইকি, বুধরাম !

কিন্তু ওদের কি লাভ? এত উৎসাহ কেন?—ভাবে নবমী।

আছে, তাদের লাভ একেবারে নেই কিছু এমন নয়। মাঝেমধ্যে এক আধটুকু সংগ লাভের আশা তাদের আছে। টগরিয়া মানুষটা রসিক, তার অনেক আলাপ-পরিচয়, অনেক কারসাজি জানা আছে তার। তখন নবমী এত কথা জানত না; এখন সব ব্যাপারটাই সে টের পেয়েছে। তা জানে সে কারসাজি—জানুক।

নবমীর কিন্তু এই ভাগানোর ব্যাপারে ঘৃণা বা রাগ হয়নি; হয়েছিল লজ্জা, লজ্জায় সে মাথা তুলতে পারছিল না, বেদনায় সে মোরে যাচ্ছিল। উইলটনে আড়াই বছর, বিশেষ কোরে দোস্তর সংস্পর্শে কয়েকবার এসে দৃষ্টিভংগীটাই যে কখন বদলে গেছে তার নবমী টেরও পায় নি। সুন্দরের মুখখানা মনে পড়লে মনে হোত তার নিজেরও এতে বুঝি দোষ আছে অনেকখানি!

শ্বশুর অসুখে অসুখে এমনিতেই দুর্বল হোয়ে পড়েছিল। ব্যাপারটাতে তার মনে লাগে প্রচণ্ড ধাক্কা। তার উপরে বহুকে অর্থাৎ নবমীকে সে যথার্থ ভালবেসেছিল। বহু হাঁড়িয়া খায় না, তাতে যেন তার একটু গর্বই ছিল—মনে হোত তার আচরণ দেখে। ছেলেকে বলতে শুনেছে নবমী—নাই খালে নেশা, হিঠ্ ভাল-এ আহে।

ভালো আছে না ছাই! একলা একলা কি জুত হয়!

ঐটেই তো সুন্দরের মাইকিরও আপত্তি। একলা একলা হাঁড়িয়া নিয়ে বোসে জুত লাগে না। অমন মরদ চাই না তার। ভারি লাট সায়েব! সত্যই তো, অত কিসের! সবটারই তো একটা জুত চাই!

কিন্তু শ্বশুর বড় বিপন্ন।

সে ইস্কুল কমিটির মেম্বর। ইস্কুলের জন্য রীতিমত খাটুনি খাটে। ছেলেগুলো যাতে সবাই নিয়মিত ইস্কুলে আসে, তাই নিয়ে বাড়ি বাড়ি তদারক পর্যন্ত কোরে বেড়ায় সে। নিজের ছেলেকেও লেখাপড়া শেখাবার জন্য চেষ্টা সে কম করেনি। কিন্তু ছোকরা জুয়ার দলে পোড়ে একেবারে বোকে গিয়েছিল। তা ঘরে ঘরে যা হয় হোত। এত বিব্রত বোধ করি তাতে সে মনে করত না। এসব নূতন নয়, আর অসামাজিকও নয় তাদের সমাজে। টাকা কড়ি মিটিয়ে দিলেই সব পরিষ্কার শুদ্ধ হোয়ে গেল। তা সুফলের টাকা আছে ; টাকার প্রশ্ন মিটে যাবে একদিনে। কিন্তু গ্রামশুদ্ধ মাতামাতি! কাসা গাঁওয়ে আর ভাজনী গাঁওয়ে এতটা তোলপাড় চলছে। সুফল যেন কেমন মনমড়া হোয়ে গেছে। মায়া লাগে নবমীর।

লুকিয়ে যায় নবমী এক সময়ে সুন্দরের ঘরে। হাত ধোরে মিনতি কোরে বলে—মিটাই লে সুন্দর! ভারি ল্যাট্‌রা হই গোল!

দুই হাতে বুকে জড়িয়ে ধোরে হাউহাউ কোরে কেঁদে ওঠে সুন্দর।—হামার মাইকিঠু গেল, যাই দে। কিন্তন তুয়ার কি হবে নম্‌মী?

সত্যই তো তার কি হবে? সুন্দরের বুকে সুন্দরের বাহুবেষ্টনে কেঁপেকেঁপে উঠছিল নবমীর সর্বদেহ। কিন্তু কী তৃপ্তি, কী আনন্দ! কেমন আবেশ লাগে মনে! এই বুকের মাঝে এমনই কোরে সবখানি নিজের ঢেলে দিতে কত সাধ ছিল তার! কত স্বপ্ন বুঝি এঁকেছিল মনে মনে! একান্ত নির্ভরতার আশ্রয়ের মত সুন্দরের বুকে মাথা ঠেকিয়ে গাল চেপে চোখ বোঝে নবমী। আঃ!

চমকে ওঠে নবমী। সরে যায় সে সুন্দরের বাহু বেষ্টন

থেকে। বুক ফেটে কান্না আসে তার। সে না মা, বুধরামের ছেলেমেয়ের মা!

মনে পড়ে তাদের বাড়ির মুরগীটাকে দেখেছে—ছানাগুলোকে কট্‌কট্‌ শব্দ কোরে কেমন ডাকে; ডেকে এনে ঠোঁট দিয়ে এগিয়ে দেয় ভাল খাবারটা তাদের সামনে। ডানা দুটো ছড়িয়ে শরীরটা ফুলিয়ে করে তিনগুণ। ছানাগুলোকে কেমন একেবারে ঢেকে রাখে; দশ-বারোটা বাচ্চার একটাও একটু দেখতে পাওয়া যায় না। ছুটে ফিরে চোলে গেল নবমী ভাজনী গাঁয়ে থেকে সোজা কাসা গাঁওয়ে। যা কিছু বলতে এসেছিল, বলা আর হোল না তার সুন্দরকে।

মায়া হয় শ্বশুরের মুখখানা দেখে। শ্বাশুড়ী তো ক্ষেপেই আগুন —মরদ না ছাই! হাঁ! মরদ বুধরাম! উয়ার তাগৎ ভি আছে, সাহসটা ভি কমতি নাই! হিম্মৎ রাখে ছোকরা! তার দুই-এটা মাইকি তো চাই-ই!—বুক ঠুকে বলে শ্বাশুড়ী।

বহু!—সস্নেহে ডাকে সুফল।—বুধরামকে বুঝাই দে বেটি!

হায়, কপাল! বুধরামকে বুঝাবে সে? দেহটা ফর্সা না হোলে এতদিনে কবে তাড়িয়ে দিত বুধরাম তাকে। অমন শাদা বুকটাতে জানটা লাগাতে কলিজাটা ঠাণ্ডা হয় খালি; নইলে নবমী আবার মাইকি! রস নাই; হাঁড়িয়াটুকু পর্যন্ত ছোঁবে না!

শ্বাশুড়ীরও আর এই পুরুষ নিয়ে পোষালো না। প্রায় রাত্রিতেই সে সম্বুন্দির ঘরে অর্থাৎ বহুর বাপের কাছে গিয়ে কাটিয়ে আসে রাত্রিবেলা। সম্বুন্দিটার এপ্রেম আছে ভারি। ভাটির

সেই সরাবটাতে ভারি স্বাদ, ভারি খোসবুই লাগে।—শ্বাশুড়ী ভাজনী গাঁওয়ে পা বাড়ায়।

নবমীর কেমন কেমন মনে হয়। বুড়ো-বুড়িগুলোর কি ভীমরতি ধরল? কিছু না, ওসব বিকার। মনে পড়ে দোস্তর কথা—শয়তান লোকের মনে থাকে রে পূর্ণিমা, শয়তান কি আর আলাদা কিছু?

শ্বশুর যেন ক্রমেই নিস্তেজ হোয়ে আসে—কেমন যেন দুমড়ে গেছে। বাঁকা হোয়ে হাঁটে লাঠি ভর দিয়ে। আহা! ভালো মানুষ বেচারা! সুফল গাঁও-বুড়াদের ধরে—কাসাগাঁওয়ের আর ভাজনী গাঁওয়ের দুই প্রবীণ নেতা।—মিটিয়ে দাও এসব, পঞ্চায়েৎ কর।

দুই গাঁয়ের পঞ্চায়েৎ বৈঠক করল একই সংগে। হাঁ, মিটে গেল। পঞ্চায়েতে বোসে পাঁচ জনার সামনে বুধরামের হাত দিয়ে সুন্দরের দাবী মিটিয়ে দেওয়া হোল। সুন্দরও বেশি কিছু বাড়াবাড়ি করলে না। বোধ করি ভাবছিল সুন্দর—নবমীটা বলেছিল! মেয়েটা বড় দুঃখ পাচ্ছে। মিটিয়ে নিল সে তার দাবী-দাওয়া। থেমে গেল সুন্দর আর বুধরামকে ঘিরে দুই গ্রামের শত্রুতা। বুধরাম সুন্দরের সাদি করা মাইকিকে সাংগা কোরে সমাজে তুলে নিল বিধিমত। কিন্তু মিটলো না বুধরামের মায়ের রাগ। মিটলো না নবমীর দুর্ভোগ।

নবমী সাদি করা মাইকি, কল্‌জা ঠাণ্ডা করা মাইকি। টগরিয়া রইল দেহ-তাঁতানো কল্‌জা গরম করা মাইকি। টগরিয়ার সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ে নবমীর উপরে। বলে—ছানা, ছানা, ছানা! নাই হলেক ছানা হামার! নবমী কলজা ঠাণ্ডা করে? ভারি

সোয়াগি! হামার ছাতিটা কামড়ে খাবেক, আর কলজা ঠাণ্ডা করবেক উয়ার বুকে! মার, মার মাইকিটাকে!

সুযোগ পেলেই কারণে অকারণে পিটিয়ে শুইয়ে দেয় টগরিয়া নবমীকে। তাতে মারও খায় অবশ্য বেদম বুধরামের হাতে। যেমন মার খায়, দেহের অত্যাচারও সইতে হয় তেমনই তাকে। অবশ্য তাতে টগরিয়ার আপত্তি নেই; বরং মত্ত অবস্থায় ও অত্যাচার চাই-ই তার।

চাই কেন! ওতে সবটা পোষায়ও না টগরিয়ার। যেই রাত্রিতে বুধরামের দেহ-মন ক্লান্ত থাকে, কলিজা ঠাণ্ডা করে সেইদিন সে নবমীর পাশে। কাসাগাঁওয়ের সৌখীন ছোকরা ঘরে এনে টগরিয়া তার কলিজাটা গরম রাখে সেদিন। টের পায় নবমী। পাশে থাকে বুধরাম; সর্বাংগ এলিয়ে দিয়ে সরল শিশুর মত পোড়ে পোড়ে কেবলই ঘুমায়। বাইরের কোন ঘটনাই টের পায় না সে। নবমীর ঘুম আসে না। সেই প্রথম রাত্রিতে মত্ত অবস্থায় শত উত্তেজনার মধ্যেও বুধরামের ভিতরে যেই মানুষটাকে দেখে নবমীর ভালো লেগেছিল, সেই ভালো মানুষটার জন্য মর্মবেদনায় নবমী জেগে থাকে; ঘুমন্ত বুধরামকে বুকে টেনে টেনে অন্তরের সকল শুভ দিয়ে শীতল কোরে তোলে। কোথায় কি ঘটে জেগে জেগে সবই সে টের পায়, সবই জানে। বলে না কিছু বুধরামকে কাউকেও বলেনি কিছু। সে শান্তি চায়। আহা! এই মানুষগুলোকে এমন পশু করল কে? বড় বাবুর মাইকি বলত—তোদের এমন জানোয়ার কোরে না রাখলে সায়েবদের পয়সা হোত কোত্থেকে?

নবমী সারারাত পোড়ে পোড়ে নীরবে এইসব কথাই ভাবতো;

মর্মপীড়ায় তার চোখ ফেটে যেত ; চাইত বুধরামকে একেবারে বুকের মধ্যে লুকিয়ে ফেলতে—তুনিয়ার আবর্জনা থেকে দূরে সরিয়ে। অন্য ঘরে দাপাদাপি চলত—শুয়ে শুয়ে সব শুনতে পেত নবমী। মনে মনে কল্পনা কোরে নিত কি কুৎসিত অন্তরংগতা চলছে সেখানে। বুধরাম একটু নড়াচড়া করলেই বুকে টেনে রাখে নবমী, কানে যেন নিজের হৃৎপিণ্ডের শব্দ বই আর কোন শব্দ বুধরামের না ঢোকে। আহা! ঘুমাক মানুষটা একটা রাত্রি!

বাড়িতে এত সব ঘটছে শ্বাশুড়ী তার খবর রাখত না ; প্রায় রাত্রিতেই সে ঘরে থাকতো না। সম্বুন্দিটা ভারি মিঠা মানুষ। ভাবতো নবমী এইসব। ভাবত মার কথা, ভাবত শ্বাশুড়ীর অদ্ভুত মতিগতির কথা, ভাবত বাপের কথা। শুয়ে শুয়ে এইসবই ভাবত, আর বুধরামকে ধোরে রাখত শান্তির প্রচ্ছায় পক্ষে।

কিন্তু শ্বশুর! শ্বশুর কি ভাবত নবমী জানে না। তবে সেও ভাবত নিঃসন্দেহ। সেই বেচারার যে কোন রাত্রিতেই ঘুম বড় হোত না তা নবমী শ্বশুরের মুখচোখ দেখেই বুঝতে পারত। জানত সব, শ্বশুর সব টের পেত। তাই বুঝি শ্বশুর টগরিয়ার হাতে পা ধোয়ার জল পর্যন্ত নিত না। ডাকত টগরিয়া! যেন বড় বিরক্ত। আর নবমা ছিল—বহু! বেটি! বেটিয়া! মাই!

ঝর্-ঝর্ কোরে তুই চোখে জল গড়িয়ে পড়ে শ্বশুরের কথা মনে পড়তে। মানুষটাকে এরা মেরে ফেল্‌লে যে সবাই মিলে মেরে ফেললে। হাঁ, মেরেই ফেললে প্রাণে—শ্বাশুড়ী, টগরিয়া আর বুধরাম। বুধরাম? হাঁ, বুধরামও বই কি।

সুফল এত অশান্তি নিয়ে আর বেশিদিন টিকল না।

একদিন বেরুল সে বেড়াতে নাতি-নাতনীর হাত ধোরে। এমন রোজই বেরোয়। লাঠি ভর দিয়ে বাঁকা হোয়ে ঠুক্-ঠুক্ কোরে হাঁটে সুফল। একপাশে তার নাতি আর পাশে চলে নাতনী। জীর্ণ দেহ টেনে টেনে এনে দাওয়ায় বসে রোজই, ডাকে—বহু, বেটি, বেটিয়া! নবমীর কোলে মাথা রেখে শ্বশুর চোখ বোজে; নবমী পাখা চালায়—অনেকক্ষণ ধোরে। শরীরটা সুস্থ হোলে উঠে বসে সুফল—অলপ্ গাইথির লান তো রে বেটি। তুয়ার গদিটা দুখাই গেল রে বেটিয়া?—হাসে সুফল, হাত বুলিয়ে দেয় নবমীর কোলের উপরে।—নাই দুখাইছে, মাই?

না—ই!—হেসে উঠে পড়ে নবমী।

সেইদিনও ফিরে এল সুফল বেড়িয়ে রোজকার মতই। কিন্তু দাওয়া পর্যন্ত আর উঠতে পারেনি। ধপ্ কোরে বোসে পড়ে দাওয়ার নীচেই। ওঃ—পোড়ে গেল মাটিতে কাত হোয়ে। ছুটে এসে কোলে তুলে নেয় অসার মাথাটা—দেহ একেবারে ঠাণ্ডা—হাত দিয়ে দেখে নবমী। শ্বশুরের নাকের ডগায় নিজের গাল লাগিয়ে স্পর্শ করে—উঃ হিম ঠাণ্ডা; নাঃ শ্বাস চলে না। ডুকরে কেঁদে ওঠে নবমী—বাবু! বাবু রে!

বুধরাম মাঠ থেকে এসে কেবল নাংগলটা রাখছিল নামিয়ে কাঁধ থেকে। ছুটে এলো বুধরাম—বাবু! ও বাবু! নিঃসাড়, নিঃশব্দ।

হাউ হাউ কোরে কেঁদে ওঠে বুধরাম, কেঁদে ওঠে সুফলের নাতি নাতনী। গাঁও শুদ্ধ ভেংগে এল—ছোট-বড়-স্ত্রী-পুরুষ। একটা মানুষ গেল রে!

সবাই বলে—একটা মানুখ না-কি একটা হাতী পড়লেক্ রে !

সবাই এল। এল না টগরিয়া। কার সংগে কোন বাঁশ বনের ধারে হয়তো তখন তার চলছিল ফিস্‌ফিসানি। আর এল না ছুটে শ্বাশুড়ী। ততক্ষণে সম্বুন্দির সংগে বোসে সুরু হোয়ে গেছে তার। সুন্দর যখন ধোরে নিয়ে এল তখন তার পা টলছে, সর্বাংগ টাল খাচ্ছে !

শ্বশুরকে মনে পোড়ে বুকে নবমীর কান্না ফুঁপিয়ে ওঠে। আজও তার দুই চোখ বেয়ে জলের বন্যা বোয়ে নামল। মুছে ফেলে নবমী চোখ। উদাস নয়নে তাকায় ঝড়ো হাওয়ায় দোল-খাওয়া গাছের মাথায় !

এইতো জীবন মানুষের ! কেবলই দোল খায় ! ভাবে নবমী—এই নিয়ে কত রং কত ঢং কত কিছু। তবু, তবু—ভাবে সে—তবু আছে সুন্দর, তবু আছে কুৎসিত কুৎসা, আছে কলঙ্ক। প্রত্যেক সমাজ-গণ্ডীর মধ্যেই মানও আছে সম্ভ্রমও আছে। তার শ্বশুর ! শ্বশুরের মানও ছিল সম্ভ্রমও ছিল। হয়তো বাইরের দুনিয়ায় সে কিছু নয়, কেউ নয়। দুর্গত-পঙ্কিল কুলি সমাজেরই লোক সে ; হয়তো আলোর সন্ধান পায়নি সে। তবু কুলি সমাজের মধ্যেই সে মানী লোক। কিসের কী একটা আলোর সন্ধানে আকুতি দেখেছে শ্বশুরের, কী যেন সে খুঁজে বেড়াত। হাঁ, হাঁড়িয়া খেত, মাতাল হোত, যৌবনে হয়তো মত্তও হয়েছে কখনও কখনও। তবু কী যেন নেই তাদের, কেমন একটা চাই চাই। শ্বশুরের মুখে চোখে তারই নিঃশব্দ চীৎকার যেন অনুভব করেছে নবমী। নবমীকে বোধ করি এরই কারণে এত ভালবাসতো শ্বশুর।

বল বেটি, বল মাই, তুয়ার দোস্তর কেচ্ছা। কী বলত রে দোস্ত? কি? আলো চাই? হাঁ, হাঁ! চাই তো জোনাক! আন্ধারে পড়লাম রে হামরা! ঠিক এ আন্ধার। বল মাই।—অতি আগ্রহ কোরে শুনতে চাইত সুফল।

চাই লেখাপড়া। লিখতে পড়তে শিখতে হবে রে, পূর্ণিমা! পড়তে পারলে তবে না ত্বনিয়াটাকে জানতে পারা যায়!

হবেক তো—লিখাপড়ি শিখতে হবেক তো! ত্বনিয়াটাকে জানতে হবেক, হাঁ।—চোখের সামনে যেন কিসের ক্ষীণ আলো দেখতে পাচ্ছে, কপাল কুঁচকে চোখের পেশি সংযত কোরে তাকাত সুফল। চোখের মণিটা জ্বল্‌জ্বল্ কোরে উঠত তার। লক্ষ্য করেছে নবমী—যেন অনেক দূরের কি চোখে পড়েছে শ্বশুরের! কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই হোয়ে উঠল না। ক্ষীণ আলো স্তিমিত হোয়ে নিভে গেল।

কেবল দপ্ কোরে জ্বলে উঠ্‌ল টগরিয়া, হু-উ-স্ কোরে উড়ে চলল শাশুড়ী! একদিকে ক্ষেপে ওঠে টগরিয়া, অন্যদিকে মত্ততা বেড়ে চলে বুধরামের মার।

টগরিয়ার অত্যাচার ক্ষিপ্ততায় পর্যবসিত হোল; নবমীর পক্ষে সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেল।

শাশুড়ী আগে দিনের বেলাটা বাড়ি থাকত; রাত্রিতে-ও সকল দিনই বেরুত না। সে এখন ঘর ছেড়েছে। সম্বুন্দির ঘরেই খাওয়া-থাকা-বসা, সম্বুন্দির ঘরেই সব। বুধরাম অনেকটা বদলেছে, বদলাতে বাধ্য হয়েছে। বাপ নেই, হাল-গরু চাষ-বাস না দেখলে নয়। দিনভর মাঠে মাঠে এটার খোঁজ, ওটার

হিসাব—ঘরের সংগে সমস্ত দিনে সম্পর্ক হোল একবার গিয়ে খেয়ে আসা। আর কেবল টই টই হৈ হৈ। না করলেও নয়। ঘরে এলে সাঁঝের বেলা—নম্‌মী! একটু খুনসুটি ; হাসি-ঠাট্টা—ঐ টুকুই পরিতৃপ্তি নবমীর। যেই দিন নেশা করল তো সেই দিন সন্ধ্যা থেকেই টগরিয়া আর বুধরাম মাতামাতি সুরু কোরে দিত।

কিন্তু টগরিয়ার রাগই তো ঐখানে।—মিঠা মিঠা বুলি, তখন নম্‌মী। কেনে, হামি মাইকি নাই? ঘর-সংসারের কথা নম্‌মীর সাথে। হামার ঘর নাই খে?

সত্যই তো, সেও তো মাইকি! কিন্তু বুধরাম বলে—তুয়ার তো ভাল্ রে টগরিয়া! ঝঞ্চাট কোনো নাই খে! খাব-দাবি আর ফুর্তি করবি।—মনে মনে বোধ করি টগরিয়াকে সংসার দিয়ে বিশ্বাস করত না সে। টগরিয়া তো—। বুধরাম হয় তো কিছু আঁচও কোরে থাকবে! তার কোন জিনিসে মায়া নেই ; সে সব খোয়াবে যদি হাতে পড়ে। কাযও সংসারের এক কানাও করে না সে। তাই করতে হয় কেবল—নম্‌মী! লে ধানটা উঠা ; হেই মাছ লান্‌লি—লে। আর টগরিয়ার রাগ বাড়ে। এক একদিন নবমীকে মেরে রক্ত বের কোরে দেয়।

অত্যাচার ক্রমেই বেড়ে চলল। একদিন মেরে একটা দাঁতই ভেংগে ফেলল টগরিয়া। নাঃ! অসহ্য! ডাক্তার ডাকা দরকার হল। অনেক দিন ঐ দাঁত নিয়ে কষ্ট পেল নবমী। তা-ও আবার ছুরি দেখায় নবমীকে—কেটেই ফেলবে। মেরেও দিতে পারে সে ছুরি। তবে একটা নিশ্চিন্দি—ছেলেমেয়ে দুটোকে মারধোর করে না। খুব যত্ন-আত্তি হয় তো করে না, তবে গালমন্দ মারধোরও

করে না। নিজের ছেলেপিলে নেই ; হয় তো স্নেহ-মমতা সন্তানের জন্য মনের কোণে একটু থাকতেও পারে।

নাই থাকব হামি তুয়ার ঘরে !—বলে নবমী।—কেনে মিছে মারধোর খাব ? বাপের ঘরে আপন মনে থাকব ; ছানা ছুটা দেই দে হাম্‌কে !

নাই দিব।—গর্জে ওঠে বুধরাম। কিন্তু কণ্ঠে তার কান্নার স্বর।—হামি তো তং নাই করলি। মারলি কত উয়াখে।

মেরেছিল সত্য। মারের চোটে জ্বর হল টগরিয়ার—বেদম তাপ দেহে। এমনিও মারত, খুব মারত। নবমীকে কিছু যদি বলত, আর বুধরাম টের পেত তা, তবে কোন খাতির করত না টগরিয়াকে !

তবু নবমীর ভাল লাগে না এসব—মারামারি, বিশ্রী বিশ্রী গালাগালি। শিশু কাল থেকেই কম কথা বলা তার অভ্যাস। লোকের সংগে ঝগড়া-ঝামেলা পছন্দ করে না। বড় হোয়ে তার মার সংগে এসব নিয়ে কত দিন কথা কাটাকাটি হয়েছে।

সব বাপের তরিখা—বলত নবমীর মা।

গণ্ডগোলের চতুঃসীমানায় যায় না শম্ভু।—নাই, ওসব বাজে ঝঞ্ঝট। সোরে থাকত সে দূরে।

একে ঝগড়া-ঝামেলা ; তার উপরে ছুরির ভয় সত্যই নবমীকে ভীত কোরে তুলল। কিছু ঠিক নেই টগরিয়ার। মেরেও দিতে পারে এক কোপ্‌। কিন্তু বুধরামকে সে এই কথা বলে নি।

—নাই, ঝুটমুট কেবল মারধোর ! আর তাতে উয়ার রাগ নাই না কমবেক ! আরু বাড়বেক।

সত্যই তাই। বুধরাম যত মারে, তার দশগুণ ঝাল ঝাড়ে টগরিয়া নবমীর উপরে। দরকার নেই সুখে তার। তার চাইতে ছেলেমেয়ে নিয়ে নিজেই সোরে যেতে চায় সে। অনেক বুঝায় বুধরাম, অনেক আদর করে।—তু হামার জান রে নম্‌মী!—গালে গাল রেখে বলে বুধরাম।

মন মানে না নবমীর। তার মনে ছুরির আতঙ্ক।

তুই কেনেক আসবি নাই হামার ঘরে, যখ্‌নি মন খোঁজে।—সান্ত্বনা দেয় নবমী।—হামি তুরারই থাকব।

—হ্যাঁ, বুঝ্‌লি হামি, সুন্দরকে সাংগা করবি, জানছি।—অভিমান করে বুধরাম।

এমনই এক সন্ধ্যায় কথা হচ্ছিল স্বামী-স্ত্রীতে। ওদিকে রবিবার। সন্ধ্যা হোতে না হোতেই টগরিয়ার সুরু হোয়ে গেছে মৌজ। ডাকের পরে ডাক বুধরামকে। বুঝি ডাকতে এসে বেড়ার ওধারে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি শুনল আর কি বুঝল; ছুটে এসে ঢোকে সোজা ঘরে। এসে ডাণ্ডা পেটা করতে লাগল—যেমন নবমীকে তেমনই বুধরামকে। নবমীর কপাল ফেটে কালসে ফুটে ওঠে। একবার রুখতে গিয়ে ডান হাতের বাহুতে বুধরামের গুয়ার মত ফুলে উঠল। বেড়াতে ঝোলানো ছিল টাংগিটা; তুলে নেয় সেটা বুধরাম—কেটেই ফেলবে। প্রাণপণ শক্তিতে কেড়ে নেয় নবমী টাংগিটা।—কী হবেক উয়াকে মারলে? উঠো তো মাতোয়ালা আছে এখন। যা তু, সাথে যা।—দুজনকে ঠেলে অন্ত ঘরে পুরে দেয় নবমী।—নাই করবি মারামারি।

বেরিয়ে আসে নবমী। একটা উদাস দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল,

সর্বাংগে কেমন জাগে উত্তেজনা। আংগিনায় ছেলেমেয়ে খেলছিল। মনটা পুলকে নেচে ওঠে। ছেলেমেয়ে নিয়ে সোজা চোলে গেল ভাজনী গাঁওয়ে বাপের ঘরে।

বাপে মায়ে শ্বাশুড়ীতে চলছে তখন—অনেকক্ষণ হবে। কথায় তাদের সকলের জড়ানো ভাব এসে গেছে। ছেলে মেয়ে নিয়ে নবমী অন্য ঘরে দরজা বন্ধ করে। মাটির উপরে উপুড় হোয়ে পোড়ে অনেকক্ষণ কাঁদলে নবমী। ছেড়ে এল, হাঁ, ছেড়েই এল ; আর ফিরবে না সে ঘরে। দশ বছর পূর্ণ হয়নি তখনও, তবু শেষ হোয়ে গেল তার জীবন, ঘর-সংসারের ইতি। যায়, যাক্‌গে। সে চায় না অমন ঘর, অমন সংসার। শিশু দুটোকে সে বের কোরে নিয়ে যাবে এই বীভৎসতার মধ্য থেকে দূরে—বহু দূরে, যদি পারে এমন দূরে যেখানে চায়ের গাছও নেই, যেখানে মায়েতে ছেলেতে মেয়েতে বাপেতে নেশা করে না। ওই চা-বাগিচাতেই বিষ ? কেউ তাদের ভাল করে না, করতে চায় না ; কেবল চায় জানোয়ার কোরে রাখতে। কেন ? পারে না সরকার-আইন কোরে এই সব—। কী সব। কী জানি কী সব, বুঝতে পারে না স্পষ্ট কোরে।

সুন্দরের কাছে জিজ্ঞাসা করেছিল একদিন। সে উইলটন বাগানে কায করে। তাদের ইউনিয়ন আছে বাগানের মজুরদের। তার একজন বড় পাণ্ডা সে। ফালতু বা বাইরেকার লোক হোলেও সুন্দর নাম লেখানো মজুর সেখানে। তার কদর সেখানে বেশ। তার ক্ষেতি আছে চাষ আছে। মজুরি না জুটলেও না খেয়ে মরবে না সে।

সুন্দর আবার ভাবনা চিন্তাও করে ভাল ভাল ; বিচার-

বিবেচনা আর বুদ্ধিও তার সাধারণের চাইতে একটু বেশি। মানুষটা বেশ সামাজিক, একটু দরদীও বটে। পাঁচটা গ্রামের পাঁচ জন ভদ্রলোকের কাছে যাওয়া আসা আছে তার; তাদের কাছে পরামর্শ নেয়, দুনিয়ার খবরাখবর রাখে সে কিছু।

জিজ্ঞাসা করেছিল নবমী—তুয়ারদের ইউনিয়ন কী ভাল্ করে রে, সুন্দর?

—কিসের কী ভাল?—শুধায় সুন্দর।

—কেনে? উয়ারদের বুলি হচ্ছেন মজুরদের ভালেই করবেক!

ঠোঁট উল্টায় সুন্দর।—বুলছেন তো বেটেক। কিন্তুক কী জানি কেবল বলে সব ইঠু চাই উইঠু চাই। কেউ আসলে নাই করে কিছু। ভাল্ ভাল্ খালি মুখের আওয়াজ। কায নাই হয় কোনো। খালি চান্দা আর চান্দা।

গম্ভীর হোয়ে গেল নবমী। তারই এত হৈ-চৈ; এই মজদুর ইউনিয়ন! দুনিয়াতে তাদের ভাল করার নেই কেউ। আঃ! তখন সে বোঝেনি, জানেনি। নইলে এত বার দোস্তর সাথে দেখা হল, তখন কিছুই জেনে নেয় নি, শিখে নেয় নি। দোস্ত বলত, ঠিকই বলত—ওসব কথা। কিন্তু—।

আর কিন্তু! সেইদিন অভিমান হত ভদ্রলোকদের উপরে। আজ তার অভিমান হচ্ছে নিজের উপরে—তখন যদি জেনে বুঝে নিত!

তবে এইটা আজ খুব স্পষ্ট বোঝে—লেখাপড়া শিখতে হবে। —বলেছিল তার দোস্ত। তার ছেলেমেয়ে দুটোকে অন্ততঃ সে লেখাপড়া শেখাবে। যেমন কোরে হোক তাদের ভদ্র পরিবেশে

নিয়ে যাবে। এর বেশি শক্তি আর তার কি আছে? সে কি পারে এই সমাজটার কিছু করতে? এতবড় কুলি সমাজ! উঠে বসে গা ঝাড়া দিয়ে নবমী।

খুঁজে পেতে যা কিছু পেল ঘরে সংগ্রহ কোরে রান্নাবাড়া কোরে ছেলেমেয়ে দুটোকে খাইয়ে শুইয়ে দিল। তারপর মাতাল-গুলোকে ধোরে এনে একটা একটা কোরে খাইয়ে দিল—যা পারল। তিনটে মাতাল একই ঘরে গিয়ে ঢোকে আবার। মনটা ভাল নয় তার। তবু যা-ই পারল খেয়ে গিয়ে শুয়ে পড়ল। নানা রকম উত্তেজনায় অবসাদে ঘুমে জড়িয়ে গেল চোখ দুটো।

ঘুম তার কতটুকু হয়েছিল জানে না নবমী। বাপ-মায়ের ঘরে তখন দাপাদাপি, গালাগালি, মারামারির শব্দে হঠাৎ ঘুম ভেংগে গেল। কী যে হচ্ছে দেখতে পাচ্ছিল না নবমী, কিন্তু হট্টরোল থেকে অনুমান করতে পারে সব। যাবে কি একবার? নাঃ! ভাল লাগে না আর এসব কুৎসিত জিনিস; দেখে দেখে মনটা পচে গেছে! যাক্ গে—খুনোখুনি করে করুক। নরক! নরক! নরক!

সত্যই বলত দোস্ত। বলত—নরক বোলে কি আলাদা আর কিছু আছে রে পূর্ণিমা? যা শুনছি তোদের সমাজের এই তো নরক। মানুষেই নরক তৈরী করে; স্বর্গও মানুষেই বানায়। নবমীর এদের আর কারুর জন্যে মমতা নেই। মরুক! এক-আধটা খুন হয় হোক? পাশ ফিরে শোয় সে। তারপর জানে না সেই রাত্রির আর কোন খবর।

সেই রাত্রিতে খুন হয়নি। খুন হোল আর এক দিন। ঘুম থেকে সকাল বেলা উঠে দেখে মা ঘরে নেই; রাত্রিতেই কোথায় পালিয়েছে। কোথায়?

কোথাক্‌লে আবার?—বাপ বলে।—ঐ জিঠু সরদার ঠেনে হবেক।

জিঠুর সংগে কিছু দিন ধোরে খুব ভাব লক্ষ্য করছে শম্ভু।—নওজোয়ান পালেক কিনা তুয়ার মাই!—ক্রুর হাসি হাসে সে।

ছিঃ ছিঃ! ভাবে নবমী—এই কী বুদ্ধি হল বুড়ো বয়সে! জিঠু হয় তো নবমীরই বয়সী হবে। আর মা? তা পঁয়তাল্লিশের কম নয়। নবমীর যেন মাটির তলায় চোলে যেতে চায় মন। কিন্তু ওদিকে ভাববারও সময় নেই। এদিকেও ঝামেলা।

বুধরাম ছেলেমেয়ে ছাড়বে না। সে পঞ্চায়েত ডেকেছে। নবমী পঞ্চায়েতে অনেক নজির দেখাল, অনেক কাঁদাকাটা করল, অনেক অনুনয় বিনয় করল। সে তো সাংগা করে নি, আর বুধরামকে ছাড়েও তো নি সে! তবে টগরিয়ার সংগে এক ঘরে থাকা যায় না। তাই সে আলাদা থাকতে চায়, থাকবে। সে বুধরামেরই থেকে যাচ্ছে, ছেলেমেয়েও বুধরামেরই থাকবে।

না—পঞ্চায়েত মাথা নাড়ে পাঁচ আসনে পাঁচ জন। মানুষের মতিগতির ঠিক নেই। না, তা হয় না। তারপর দুদিন বাদে অন্য পুরুষের ঘর করলে, তখন? বাচ্ছা দুটো একবার পর হোয়ে গেলে যাবে কেন তখন আর ফিরে বাপের ঘরে!—নাই,

নাই, হি কথা ভাল্ নাই সমঝাই।—পাঁচটা বিজ্ঞ মাথা একই ভাবে দুলে ওঠে।

রায় দিলে পঞ্চায়েত—বুধরামের ছেলেমেয়ে, বুধরামকে দিতে হবে। রাত্রিতে বুধরামকে তবু আবার অনেক বোঝাল, অনেক মিনতি করল; খুসী করার জন্য রাত্রিটা বুধরামকে তার কাছে ধোরেও রাখল।

নম্‌মী! তু চ সাথে হামার ঘরকে!—বুধরাম উল্‌টে মিনতি করে।—ছোড়তে লারি তোকে; কলজাটা দুখায় ভারি।

বুধরামের সর্বদেহে সর্বাংগ মিলিয়ে কলজাটা বুধরামের ঠাণ্ডা করে নবমী। কিন্তু উহুঃ! ঘুম থেকে উঠে ছেলেমেয়ের হাতে ধোরে বেরিয়ে পড়ে বুধরাম। আংগিনায় দাঁড়িয়ে বলে—নাই যাবি নম্‌মী! গোলা-বাড়ি সব তুয়ারই বনাই আছে; সব ছানভান হই গেলেক!

নবমী কোন জবাব দিলে না; বাইরেও বেরিয়ে এল না। বোসে বোসে চোখের জল ফেলে। সব ভেসে গেল! কত আশা কত কল্পনা! নূতনভাবে গড়বে সে ছেলেমেয়ে দুটোকে। সব কিছু চুরমার হোয়ে গেল তার।

ওরা চোলে গেল। মাটির উপরে উপুড় হোয়ে পোড়ে কেঁদে ওঠে নবমী।—দোস্ত! জানোয়ার হামরা। জানোয়ার লে নিজ্জন্ দোস্ত!—আর দোস্ত। হায়! হায়! হাহাকার চারিদিকে নবমীর। মনের মধ্যে হারিয়ে ফেলার হাহাকার। হাহাকার ছেলেমেয়ের জন্য, হাহাকার এই দুর্গত সমাজের জন্য। বুকটা জ্বলে যায়! মা-ও বা কোথায় গেল? আর পারে না সইতে নবমী এই নরক।

কোথায় আবার ? সত্যই সেই জিঠু সর্দারের কাছে। মাইকি ! —হাসে, হেসে পরিচয় দেয় জিঠু বাবুদের কাছে, সবায়ের কাছে। বুড়ি মা তার নতুন কোরে ঘর বেঁধেছে, সংসার পেতেছে নওজোয়ানের সংগে।

শম্ভু বলে—খুন করব !

শিউরে ওঠে নবমী—কাখে, বাবু ?—বাপকে বোঝায়—ছোড়ে দে, যেতে দে ওসব বদমাইসি।

নাই দেব যেতে, নাঁই দেব-ও !—ধক্‌ধক্ কোরে জ্বলে ওঠে শম্ভুর চোখ ছুটো।

কাকতিকে পেল একদিন পথে নবমী। কাকতি ভাজনী গাঁওয়েরই মানুষ ; উইলটনে কায করে সে। জিঠু উইলটন বাগানেরই সর্দার। কাকতিকে কুলিমজুর সবাই মানে। নবমী তাকে পায়ে ধোরে মিনতি করেছিল—সর্দারকে বোলে সম্পর্কটা ভেংগে দিক তার মা আর জিঠুর। কিন্তু ফল কিছু হল না। হবে বা কেন ? এসব নোংরা ব্যাপারে মাথা গলাতে যাবে বা কেন লোকে !

আর বলেই বা কাকে ? এদিকে শ্বাশুড়ী ঘর-বাড়ি-সংসার-ছেলে-নাতি-নাতনী সব ছেড়ে এসে এখানে আড্ডা করেছে। বলে—শম্ভু, মোটা লাগে হামার।

আবার শম্ভুও বলে—উই তো হামার মাইকি। নম্‌মীর মাঠু তো ছোড়ে গেলেক।

হায় অদৃষ্ট ! নবমীর মায়ের কথা বলতে শম্ভুর চোখ ছুটো দপ্ কোরে জ্বলে ওঠে।

ভুলে যা ; ছেড়ে দে।—বলে সবাই ; বলে নবমী।

হাঁ, ছোড়াই দিব।—চোখ দুটো হিংস্র ক্রুর হোয়ে ওঠে শম্ভুর।

বাপের জন্য নবমীর মনটা বেদনায় টন্‌টন্‌ করে। বুড়ো বয়স। আর হয়তো জীবনে তার বাপের দেখা পাবে না। কান্নায় তার বুক ভোরে ওঠে। হুহু কোরে জল এসে চোখ ছাপিয়ে দেয়। এই তো মানুষ, এই তো মানুষের জীবন!

শম্ভু গোবেচারা মানুষ। সাতে পাঁচে থাকত না; সহজে কোন্ গণ্ডগোলের মধ্যে মাথা গলাত না। অথচ সেই গোবেচারা শান্ত মানুষটা একেবারে খুন কোরে বসল। একটা মাত্র মেয়ে। বিয়ে দিল তাকে এত দেখেশুনে। তার জীবনটা মাটি হোয়ে গেল। দাঁড়িয়ে দেখল শম্ভু। তারপর স্ত্রীটা গেল ঘর ভেংগে। বুঝি শম্ভুর মাথাটাই বিগড়ে গিয়েছিল।

সেই দিনও এমনই আকাশে মাটিতে কালোয় কালোয় মিশে গিয়েছিল। ঝড় বাতাসের মাতামাতি চলছিল এমনই। সন্ধ্যার আগে থেকেই সুরু। সমস্ত রাত্রি চলেছিল মুষলধারে বৃষ্টি, দমকা বাতাসের জাপটাজাপটি, বিজলীর ঝলসানি আর মেঘের গর্জন।

ভোরে চিকচিকে আলো এসে পড়েছে ঘরের মধ্যে খিড়কির ফাঁকে ফাঁকে। ঘুমিয়ে পড়েছিল নবমী সমস্ত রাত্রির পরে বোধ করি ভোরের দিকে। রাত্রিভর মনটাতে বড় অস্বস্তি—কত রকম চিন্তা তার মনে এল আর লয় পেয়ে গেল। সন্ধ্যার আগে এসেছিল বুধরাম ; অনেক রাত্রিতে ফিরেছে সে।

—চ নম্‌মী, ঘরকে চল। হামি—।—আর কিছু বলে না

বুধরাম। আবেগভরা চোখ দুটো মুখের দিকে তুলে শুধু বলে—ঘর চ।

কিন্তু কেন? আর কিসের মোহে যাবে সে? ঝামেলা আর ভাল লাগে না নবমীর। তার বলতে সংসারে আর কী-বা আছে। হাঁ, ছেলেমেয়ে দুটা। দূর ছাই! বুধরামের সন্তান বুধরামেরই কাছে আছে। তার ওসব নিয়ে ভাবনা কোরে লাভ কি ছাই! মায়ের বুকে বেদনা বাজে, না? বাজে। তবু, তবু! যাক্, চায় না সে আর কিছু। চায় না আর সংসারের ভূয়ো মোহে জড়িয়ে পড়তে। কোন উত্তর করল না নবমী; চুপ কোরে বসেই রইল সে আগাগোড়া যতবার মিনতি কোরে ডাকছিল বুধরাম। কেবল দুই গাল গড়িয়ে চোখের জল পড়ছিল অবিরল।

যাবে? কিন্তু গিয়ে লাভ? সুখের আশা তার আর নেই। অশান্তিও কমবে না। টগরিয়াকে ছাড়বে না বুধরাম, ছাড়তে পারবে না—বুঝেছে নবমী। ছেড়ে দরকারও নেই। সে একলা দুঃখ পেয়েছে, পাচ্ছে। তার দুঃখ তারই থাক। দুঃখ না থাকলে লোকের মন সাফ্ হয় না—বলেছিল দোস্ত। বোসে বোসে শেষে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে উঠে গেল বুধরাম।—নাই যাবি নমমী!

কোন কিছুই বললে না নবমী। তার বুকের মধ্যে তোলপাড় হচ্ছিল কেবলই। বুকের পাঁজরাগুলো পর্যন্ত টনটন্ করছিল। কথা কী সে বলবে? একটা কথাও তার মুখ দিয়ে বেরুল না। বুধরাম চোলে গেল, মনে হল তার যেন একটা হাতী বুকের উপর দিয়ে মাড়িয়ে গেল।

দাওয়ায় এতক্ষণ চুপ কোরে বোসে ছিল শম্ভু। জামাই চোলে

গেলে ঐ ঝড়ের মতই গর্জন কোরে ওঠে—শালা বুঝি খোসামুদী করতে আইল রে নম্‌মী !

বাপের কণ্ঠস্বরে চমকে ওঠে নবমী।—নাই, হেই ঘাটে যাইছিল।—নিজেকে সামলে উত্তর করে বাপের কথার।

—হুঁ ! যেন হাঁড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে এল শম্ভুর গলায়।

নম্‌মী আছে চাচা ?—সুন্দর সোজা উঠে আসে ঘরের ভেতরে। একেবারে গা ঘেসে বোসে পড়ে। মুখের কাছে মুখ এনে শুধায়—বুধা আইল কেনেকে রে ?

নাই জানি।—সংক্ষেপে উত্তর করে নবমী।

খিচরাইল বুঝি ?—হাত দিয়ে নবমীর মুখখানা ঘুরিয়ে নিজের দিকে কোরে নেয়।

নাই, নাইঃ ! উয়ার খিচরাবার একতারঠু কি ?—গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ায় নবমী।

সুন্দর নাছোড়বান্দা ; নিজেও উঠে দাঁড়ায় ; বুকের কাছে টেনে নেয় নবমীকে। সোরে যায় নবমী। কিন্তু পুলক জাগে সর্বদেহে ; ভাল লাগে বড় সুন্দরকে, সুন্দরের স্পর্শ। সুন্দরও কিছু বাড়াবাড়ি করল না। এটা-ওটা দুটো একটা ছোট বেলার কথা বোলে চোলে গেল ; কিন্তু কি যেন একটা ফেলে রেখে গেল। বারবার তার স্পর্শ লাগে নবমীর। সমস্ত রাত্রি সে ঘুমাতে পারে নি। মনের মধ্যে এক তুমুল তাণ্ডব চলছিল তার। মনে যেমন বেদনা সর্বাংগে তেমনই জ্বালা ধোরে গেছে। তার উপরে মায়ের কথা মনে পোড়ে রক্তে যেন বিষ লেগে গেল। ভোরের দিকে বুঝি ঘুমিয়ে পড়েছিল, স্বপ্ন দেখে ধরফরিয়ে উঠে বসে নবমী।

শম্ভু বুধরামকে—খুন করেছে ; টাংগির এক ঘায়ে ধর থেকে মাথাটা আলাদা হোয়ে গেছে। নবমীরই পাশে শুয়ে ঘুমোচ্ছিল বুধরাম। ঘামে নেয়ে উঠেছে নবমী। গলা শুকিয়ে তার কাঠ হোয়ে গিয়েছে। কিন্তু বুধরাম আসবে কোথা থেকে তার পাশে ? না, পাশে কেউ তো নেই! জাগরণের অবসাদে টাল খাচ্ছিল নবমী ; টলতে টলতে পা টেনে টেনে বাইরে আসে। এত বেলা হোল, বাপ কই ?

মুখ হাত ধোয় নবমী। ঘরের কায সারে। বেলা বেড়ে গেল, তবু শম্ভুর দেখা নেই। এমন তো যায় না সে কখনও কোথাও। কোথায় বা যাবে ? উৎকণ্ঠিত হোয়ে ওঠে নবমীর মন ক্রমেই।

স্বপ্ন কি সত্য হয় ? শিউরে ওঠে নবমী। সামনেটা যেন তার কেমন ফাঁকা হোয়ে গেছে। বুক দুরু দুরু কোরে ওঠে। বাইরে তাকায় নবমী।

দূরে ঐ পথ ধোরে কে যাচ্ছে ? বুধরাম না ? হাঁ, বুধরামই তো। নাংগলটা কাঁধে, আগে আগে চলছে দুটো গরু—তাড়িয়ে নিয়ে চলছে বুধরাম। সারা সকালটার মধ্যে এই বোধ করি প্রথম স্বচ্ছন্দ শ্বাস-প্রশ্বাস চলতে লাগল নবমীর বুকের মধ্যে। হাঁ, স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে বুধরামকে। কাল বৃষ্টি হোয়ে গেছে, আজ মাঠে নাংগল দিতে যাচ্ছে তাই বুধরাম।

বেলা বেড়ে চলল ; শম্ভু অনেক বেলায়ও ফিরল না। বারবার বাইরে সন্ধানী চোখ তুলে ধরে নবমী বিস্তীর্ণ মাঠের দিকে। ঐখানে শম্ভুর মাটি আছে। কিন্তু না, গরু দুটো তো ঐ পাশেই

ঘাস খাচ্ছে ঘুরে ঘুরে। তবে? কি যেন একটা কেমন ভয় ভয় মনে তার!' নানা কথা ভাবতে ভাবতে বোধ করি একটু অন্যমনস্ক হোয়ে পড়েছিল নবমী।

নম্‌মী আহে।—ব্যস্ত কণ্ঠে ডাকে সুন্দর।—নম্‌মী আহে রে?

আহে।—জবাব করে শাশুড়ী ঘরের ভিতরে থেকে। কি করছিল কে জানে?

অন্যমনস্ক নবমী ঘার ফিরিয়ে দেখে কেবল। সুন্দর সোজা এসে মুখোমুখি বসে নবমীর সামনে। গলাটা খুব নীচু কোরে বলে সুন্দর। নবমী উদ্‌ভ্রান্তের মত শোনে সব কথা, শিউরে শিউরে উঠছিল তার দেহ; কেমন যেন হিম হোয়ে গেল তার সর্বশরীর।

কখন ঠিক ঘটেছে ব্যাপারটা জানে না সুন্দর। তবে শম্ভু জিঠুকে সাবার কোরে সোজা গিয়ে হাজির হয়েছিল বড়ডুবি থানাতে—কাঁধে ছিল তার রক্ত-মাখা টাংগিটা। রাত্রিতে পোঁছাতে পারে নি; থানায় যখন সে হাজির হোল তখন ভোর হোয়ে গিয়েছিল।

—খতম, হুজুর! একদম ছোড়াই দিলি, হুজুর!—সেলাম কোরে দারোগাকে নিজেই বলে শম্ভু সব কথা। মোটর কোরে শম্ভুকে সংগে নিয়ে রওনা হবে দারোগা, এমন সময় উইলটনের সাহেবের চিঠি নিয়ে পোঁছল পিয়ন।

নবমীর চোখ দুটো বড় বড় হোয়ে উঠেছে শুনতে শুনতে, তবে কেমন যেন তেজ নেই ও চোখে একেবারে। সুন্দর তবু একটু দূরে সোরে বসে। ঐ খুনী শম্ভুরই তো মেয়ে!

নবমী ভাবছিল—এমন ভাল মানুষটা! খুন কোরেও পালায়

নি, নিজেই গিয়ে থানায় হাজির। অর্থহীন বড় বড় চোখ দুটো থেকে ঝর্‌ঝর্‌ কোরে জল গড়িয়ে পড়ে। আর তার মা? জল-ভরা চোখ দুটো যেন ধক্‌ কোরে জ্বোলে ওঠে। সুন্দরের ভয় লাগে, আরও একটু সোরে বসে দূরে। দাঁতে দাঁত পিষে নবমী। মাকেও দিতে পারলে না সাবার কোরে ঐ একই সাথে! যত পাপ ছড়িয়ে বেড়ায় ওরাই। শোনে কানে—পূর্ণিমা! পাপ মানুষের ঘরে একার কারণে আর একটা কারণে ঘটে না রে!—চমকে ওঠে নবমী। একথা অনেক আগে একদিন বলেছিল দোস্ত। মনে পড়ে নবমীর সেই কথা। হাঁ, মাকেও সাবার করলে না কেন বাপ? কি রকম অস্বস্তি বোধ করে নবমী। পেলে বুঝি বাপের অসম্পূর্ণ কাযটা সে-ই পূর্ণ কোরে দিত।

সামনে দিয়ে ভয়ে ভয়ে গুটিগুটি পথ ধরল শ্বাশুড়ী কাসা গাঁওয়ের দিকে। সেই যাওয়া আজও নবমীর চোখে ভাসে। ঐ যে গেল আর ভাজনীমুখো হয় নি। ঘরের ভিতর থেকে সুন্দরের কথাগুলো শুনতে পেয়েছিল সে। হাত দুটো নিষপিষ করে নবমীর। সুন্দরও বোধ করি ভয় পেয়েছিল, কী দেখে কী বুঝে আজও জানে না নবমী।

সুন্দর নিঃশব্দে উঠে বেরিয়ে গেল। কী ভেবেছিল তখন নবমী তা আর আজ মনে করতে পারে না। হাঃ হাঃ কোরে হেসে ফেটে পড়ে নবমী। ভয়ে ভয়ে বুঝি পিছু তাকাল সুন্দর; পা দুটো আরও জোরে চালিয়ে দিল। সে কেমন যেন ত্রস্ত ভাব! আজও নবমীর চোখের সামনে ফুটে ওঠে সুন্দরের সেই ভীত চাহনি, আর ত্রস্ত পদে চোলে যাওয়া।

সুন্দর চোলে গেল। বুকখানা হঠাৎ কেমন একেবারে ফাঁকা হোয়ে গেল নবমীর। নাকের ভিতর দিয়ে শ্বাস বুঝি আর চলে না, দমও ক্রমে যেন বন্ধ হোয়ে আসে। মাথাটাতে কেমন একটা ঝিম ধোরে গেল। চোখের সামনেকার দিনের আলো যেন মুছে গেল, সবই কালো মিশ্ কালো অন্ধকার! সেই অন্ধকারের মধ্যে কি রকম যেন ছিট্ ছিট্ আলো ফুটে ফুটে নিভে যেতে লাগল। মাটিতে গড়িয়ে পোড়ে চোখ বোজে সে সেই দাওয়ারই উপরে। কতক্ষণ পোড়ে ছিল এমন আজ আর মনে করতে পারে না নবমী। চোখ খুলে দেখে পোড়ে আছে নিজে মাটির উপরে উপুড় হোয়ে—সাঁঝের অন্ধকার নেমে আস্ছে ঐ দূরে মাঠে। মাথার কাছে গালে হাত দিয়ে বোসে বুধরাম।

উঠে বসে নবমী। চোখের দৃষ্টি তার অর্থহীন। কাছে সোরে আসে বুধরাম।—ঘরকে চল্ নম্মী!—বড় করুণ চোখ দুটি বুধরামের! উদাস চোখ মেলে ধরে নবমী বুধরামের মুখে। সর্বাংগ কাঁপিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল তার। একটা কথাও বল্লে না সে; মাঠের দূর প্রান্তে তাকাল একবার ভাবহীন অর্থহীন চোখে; তারপর উঠে দাঁড়াল সে।

বুধরাম ভাবে—তবে যাবে বুঝি ঘরে। সে-ও উঠে দাঁড়িয়ে আরও একটু কাছে সোরে আসে। নবমী নির্বাক নিঃশব্দ। উঠে চোলে গেল ঘরের ভিতরে। বুধরামকে যেন সে দেখতেই পায়নি। ঘর ঝাঁট দিল নবমী; তারপর চুল বাঁধতে সুরু করল সে। ঘরের খুঁটিতে ঝোলানো বড় গোল আয়নাটা সামনে—দোক্তর সিসির দেওয়া আয়নাখানা। এই সব সেঁজুতি কায শেখা তার

উইলটনে ঐ বড় বাবুর ঘরে। বাইরে দাওয়ায় দাঁড়িয়েই আছে বুধরাম। নবমীর আজ আবার ঘটনাগুলো একটার পরে একটা চোখের সামনে ভেসে উঠছিল।

চুল বাঁধা হোলে বাইরে এল নবমী। কুঁয়ো থেকে জল তুলে হাতমুখ ধুয়ে নিল; জামাকাপড় কাচল। বুধরাম সেই-খানেই দাঁড়িয়ে আছে। ঘরে গিয়ে বসল বাতি জ্বেলে দোস্তর দেওয়া হাতের লেখার খাতাটা আর পেন্সিল নিয়ে। কিন্তু নাঃ মন বসে না। তবু ঐ নিয়েই বোসে রইল।

বুধরাম এসে নিঃশব্দে ঘরে ঢোকে ধীবে ধীরে। নবমীর একেবারে গা ঘেসে বসে; একেবারে গায়ে গা ঠেকিয়ে।—ঘরকে চ নম্‌মী!—মুখের কাছে মুখ এনে করুণ দৃষ্টিতে তাকায় নবমীর দিকে; চোখ দুটিতে যেন রাজ্যের আবেদন।

—নাইঃ! নাই যাব কাঁহাকে। হামার নাই খে কোন দুনিয়ায়।—সোরে যায় নবমী। অভিমানে বুকটা তার ফুলে ফুলে উঠছিল। বলে—হাঁড়িয়াখোয়া মাতাল সব!

সেই দিন আর বুধরাম রাগ করে না। আবার এগিয়ে যায় নবমীর গা ঘেসে।—হিঁয়া তু একেলা!—পিঠে নবমীর হাত রাখে।

ফোঁস কোরে ওঠে নবমী সাপের মত; ঝট্ কোরে উঠে দাঁড়ায়।—যাঃ, ভাগ, বেশি তং নাই করবি। খুনী শম্ভুর বেটী আহে নম্‌মী, ভাগ।—দেওয়ালে ঝুলান দা-টা মুঠো কোরে ধরে, আর ফুলে ফুলে কেঁপে কেঁপে উঠছিল বারবার।

নে কাট, কাটি দে।—এগিয়ে যায় বুধরাম ঘার নীচু কোরে

একেবারে নবমীর বুকের কাছে।—কাট, কাটি লে গর্দানটা।—ভয় পায় না সে মোটে।

বড় ভাল তো আজ বুধরাম! তবু মাথা নেড়ে অস্বীকার করে নবমী।—নাই, নাই যাব হামি তুয়ার ঘর।

হামার একেলার ঘর নাই আহে? তুয়ার ঘর নাই খে?—অনেক মিনতি করল বুধরাম, অনেক বোঝাল নবমীকে। হঠাৎ যেন কেন মাটির মানুষ হয়েছিল বুধরাম সেই দিন। মিষ্টি লাগছিল বুধরামের আচরণ বড়। আছে, বুধরামের ভিতরে একটা সজ্জন মানুষ; আরও অনেকবার দেখা গেছে সেই ভালোমানুষটাকে বেরিয়ে আসতে। কিন্তু না, নবমীর আর মাতোয়ালা মানুষ-গুলোকে মোটে সহ্য হয় না। কেবল বলে—না, নাই যাব। আর কোন কথাই মোটে বলে না সে।

বুধরাম দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে শেষ অস্ত্র হানে।—তুয়ার মন সুন্দরকে ঘর মাংগ্‌ছে, বুঝলি হামি।

হাঁ,—যা, যাঃ তু।—খিঁচিয়ে ওঠে নবমী।

বুধরাম বেরিয়ে গেল। নবমী মনে করে যেন আপদ গেল। সে আবার বাতির ধারে গিয়ে খাতা পেন্সিল নিয়ে জুটিয়ে বসে।

নম্‌মী আহে রে ঘর?—সুন্দরের গলা।

নাই খে।—খেঁকিয়ে ওঠে নবমী। কী পেল আজ লোকগুলো! —নাই খে ঘর। ভাগ্‌, ভাগ্‌! কুকুর সব।

মোটা কুকুর!—হাসতে হাসতে খুব কাছে ঘেসে বসে গিয়ে সুন্দর।

মাথা গুঁজে বোসে ছিল নবমী। হাত বাড়িয়ে চিবুক ধোরে

নবমীর মুখখানা তুলে ধরে।—এত গোস্‌সা কেনে রে নম্‌মী!—হাসে সুন্দর।

নবমীর মুখে কেমন যেন হাসিতে ভরে ওঠে। কিন্তু লাফ দিয়ে উঠে যায় সে—ভাগ্‌ হঁহাসে, নাই তো···। দেওয়ালে ঝুলানো দা-টাতে হাত দেয় আবার।—ভাগ্‌, নাই তো···।

নাই তো···! সুন্দরও উঠে গিয়ে সাপটে ধোরে টেনে আনে নবমীকে একেবারে নিজের বুকের মধ্যে; দুই বলিষ্ঠ বাহুতে চেপে ধরে।—নম্‌মী!

সুন্দরের বুকের উপরে মাথাটা এলিয়ে দিয়ে চোখ বোজে নবমী। দুই হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে সুন্দরকে, দুই চোখ দিয়ে বর্ষার ধারার মত জল গড়িয়ে পড়ে সুন্দরের বুকে। বুঝতে পারে সুন্দর। মাথার উপরে গাল রেখে পিঠে হাত বুলোয়।—বুধরাম কী বললেক্‌ রে—নবমী?—মিঠা সুরে প্রশ্ন করে সুন্দর।

তড়িৎস্পৃষ্টের মত ছিটকে সোরে যায় নবমী—ভাগ্‌। ভাগ যা, দুসরকে মাইকি ভুলাইতে আইলি। ভাগ্‌।—দা-টা এবার সত্যই ডান হাতে তুলে নেয় নবমী; বাঁ হাতে আঁচল দিয়ে চোখ মোছে।

সুন্দর কি বুঝল, কি মনে করল—আজও জানে না নবমী। কোন দিন এ কথা তোলে নি সে; সুন্দরও প্রসংগটা আর কখনও উঠায় নি। আর সে বড় একটা আসেও না। কোথাও তেমন যায়ও না সুন্দর। কেমন যেন হোয়ে গেছে মানুষটা! কখন কখন যদিও বা কোথাও যায়, তো যায় নবমীরই ঘরে। এলেও দাওয়ায় বোসে দুটো চারটে একথা সেকথা বোলে উঠে চোলে যায়। মুখে তার সেই সর্বক্ষণ-লাগা হাসি আর দেখতে পাওয়া যায় না। চোখের

কোলে অল্প-অল্প কালি দেখা দিয়েছে, যদিও চোখের কোলে কালি পড়ার বয়স তার হয়নি। নবমীরই তো বয়স! হয় তো এক-আধ বছরের বড় হোতে পারে। মুখখানা দেখলে মায়া লাগে নবমীর! শুনেছে হাঁড়িয়া ধরেছে সুন্দর। বাগানের কায ছেড়ে দিয়েছে, কেবল চাষ-বাস করে, আর ঘরেই থাকে। একাই নাকি হাঁড়িয়া খায় ঘরে বোসে বোসে; কাউকে ডাকে না, কারুর ঘরে হাঁড়িয়ার নিমন্ত্রণে যায়ও না। সবাই বলে—নম্‌মী লে মন উদাস হোল্।—নবমী কিন্তু খুব অতিরিক্ত খাতির করে না। লোকের মুখে শুনেছে, হাঁড়িয়ার গন্ধ কখনও পায় নি সুন্দরের মুখে। প্রশ্ন কোরে জানতেও চায় নি সে। খায় খেল—তার কী দরকার জেনে! তবু আজও যেন সেই দিনকার নিবিড় স্পর্শ তার মনকে দোলা দেয়, শিহরণ জাগে দেহে। চোখ বুজে সুন্দরের বুকে বাহু-বেষ্টনীকে অনুভব করে, দেহ মনে বড় পুলক জাগে। কিন্তু তার ছেলেমেয়ে দুটোকে যদি পেত! আজও সেই একই কথা বারবার মনে পড়ে। কিন্তু—নাঃ—।

নাই, নাইঃ।—মনে পড়ে আদালতে বাপকে জড়িয়ে ধোরে চীৎকার করে কেঁদেছিল নবমী। সে কি মর্মন্তুদ কান্না! বোধ করি হাকিমের চোখেও জল এসে গিয়েছিল। কী দোষ আছে শম্ভুর? সত্য সে নিজেই স্বীকার করেছিল। তবু কালাপানি? দোস্ত বলেছিল—সত্য কখনও ফালতু যায় না। তবে? শম্ভুর কী দোষ? দোষ তো সব ঐ রাক্ষুসীর—তার মায়ের! ইনিয়ে-বিনিয়ে অনেক কেঁদেছিল নবমী; বার বার শুধু এই বলতে চেয়েছিল সে যে সব দোষ মার হুজুর!

আগাগোড়া ঘটনাগুলো একটা একটা কোরে বোলে গেল

হাকিমের কাছে—ধীর শান্তভাবে। একটা কথাও মিথ্যা বলে নি, একটু বিচলিত হয়নি শম্ভু। কেবল বলতে বলতে হাউ হাউ কোরে কেঁদে উঠেছিল—হামার একটা ছুকরী, একলা হোল—বলতে পারে নি আর। নবমীও স্থির থাকতে পারে নি, ছুটে গিয়ে বাপকে জড়িয়ে ধোরে কেঁদে বলেছিল—নাই, নাই, নাই দিব বাবু তুয়াকে, নাই ছাড়বি হামি।

পুলিশ বাধা দিতে গিয়েছিল; হাকিম নিষেধ করেছিলেন—নাই, কাঁদতে দে বাপ-বেটীকে। মা দূরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল সেই দৃশ্য; সাক্ষ্য দিতে এসেছিল সে আদালতে। বলতে সে পারে নি তেমন কিছু। দেখেনি কিছু, জানে না সে কোন কথা—নেশায় অচৈতন্য ঘুমিয়ে ছিল ঘটনা যখন ঘটেছিল। ভোরে ঘুম ভেংগে দেখেছে সে জিঠুকে তারই পাশে কে দুই টুকরো কোরে রেখে গেছে। শম্ভুকে সে সন্দেহও করে নি।

বলেছে সে আদালতে—উয়ার তর ভাল মানুহে—। তার সন্দেহ করার কোন কারণ ছিল না।

মা অন্ততঃ শম্ভু ভালো মানুষ, এই কথাটা স্বীকার করেছিল। বাপ-বেটীর কান্না দেখে বোধ করি মায়ের চোখেও জল এসেছিল। আজ মনে পড়ে যেন দেখেছিল মাকে চোখের জল মুছতে। আদালত থেকে বেরিয়ে আর মাকে সে দেখতে পেল না। কোথায় যে গেল আজও সে জানে না। কিন্তু সত্য তো কোন সুফল ফলায় নি। বাপ ধরা নিজে না দিলে ধরতে পারত না তাকে! মা সন্দেহ করে নি, সে শম্ভুর নাম উল্লেখও করত না। তবে, তবে কেন শাস্তি ভোগ হোল?

নবমীর মত মেয়ে তো আর বোঝে না যে সত্যাসত্যের প্রশ্ন আলাদা, শাস্তি হয়েছে অপরাধের। বাপকে হাতকড়া দিয়ে কোমরে দড়ি বেঁধে দুই দিকে দুই পুলিশ ধোরে নিয়ে গেল; সইতে পারে নি সেই দৃশ্য নবমী; তাকাতে পারে নি সে বাপের দিকে; ছুটে বেরিয়ে এসেছিল আদালত থেকে।

বেরিয়ে এসেই দেখে সুন্দর আর বুধরাম দাঁড়িয়ে পাশাপাশি; ভাজনী আর কাসা গাঁওয়ের আরো আরো কত লোক—মেয়ে-পুরুষ। সবাই বলছিল—মাইকিএটার দোখ্।

অপরাধ যেন সব নবমীর, সে কারুর মুখের দিকে তাকাতে পারে নি। যে যাই বলুক—বাপ তার, তারই মা।

নবমী বুধরামকে জড়িয়ে ধোরে ডুকরে কেঁদে ওঠে—বাবু আর নাই ফিরবেক্ রে! হামি একেলা—একদম একেলা হোই গেলি।

বুধরাম বুঝি কোন কথাই খুঁজে পেল না, কেবল দুই বাহুতে জড়িয়ে বুকে টেনে নিয়েছিল; আবেগভরে বলেছিল—চ, ঘরকে চল্। চোখ দুটো তারও ছল ছল কোরে ওঠে, গলায় কথা যেন জড়িয়ে আসে কান্নায়।

নবমী আকাশের দিকে তাকায়—ভগবান, এই মানুষগুলোকে মানুষের মত বাঁচতে সুযোগ দাও। এদের যে তুমি বই আর কেউ নেই।

সেই দিনও আদালতের বাইরে এসে শূন্যে তাকিয়ে এই কথাই বুঝি বলেছিল সে একান্ত মনে। আর বুঝি ভেবেছিল একজনার কথা। সে দোস্ত। পারে, পারে সেই মেয়ে এমন কাঁচা মাটির গড়া মানুষগুলোকে বাঁচিয়ে তুলতে। বাপের আচরণ থেকে এই সত্যটাই

কেবল মনে হচ্ছিল বার বার—কাঁচা মাটি কাঁচা মন! সত্যই তো কাঁচা মন না হোলে অপরাধ গোপন করার চেষ্টাই ছিল স্বাভাবিক—তা মনোবিজ্ঞানের তত্ত্বসূত্রে ব্যাখ্যা এর যেমন ভাবেই লোকে করুক না কেন।

নবমী বুধরামের হাত ধোরে এসে বাসে উঠল। ডিব্রুগড় থেকে তেরো মাইল পথ—বাসে ছাড়া আসার আর কোন উপায় নেই। বাসে উঠে একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে এল, সমস্ত শরীরটা তার কেঁপে কেঁপে উঠছিল—বাবু! দুই হাতে মুখ ঢাকে সে।

বুধরাম সযত্নে নিজের বাহুবেষ্টনে ধোরে রইল নবমীরই পাশে বোসে। সারা পথ কারুর মুখে কথা নেই। সেই সময়টার কথা মনে কোরে আজ যেন কেমন পুলক জাগে নবমীর মনে। এমন ভদ্রভাবে এত নিবিড় কোরে এত কাছে বুধরামকে আর কবে যে পেয়েছিল মনে তার পড়ে না।

সেই বাসেই সুন্দরও এসেছিল। ভাজনী গাঁও কাসা গাঁও আর রামকানাই গাঁওয়ের যে সকল লোকেরা মামলার শুনানী শুনতে গিয়েছিল, তারাও সবাই ছিল সেই বাসে। কারুর মুখে কোন কথা নেই! নবমী লজ্জায় দুঃখে মাথাও তুলে তাকায় নি আগাগোড়া পথে।

নামল সবাই একই জায়গায়; পাশাপাশি তিনটি গ্রাম—একই পথ তিন গ্রামে যাওয়ার। পায়ে পায়ে এগিয়ে চলে সবাই। যার যখন যেতে হয়, ডাইনে বাঁয়ে পথ ভাংগে। নবমীর মাথায় হাত রেখে বোলে গেল সবাই—কি করবি, সবই ভাগ্য।

ভাগ্যই বটে। জীবনটাই তো তার ভাগ্য বিড়ম্বনার মধ্যে দিশা হারিয়ে গেছে।

বুধরাম আগাগোড়া পথে হাত ধোরে ধোরে এল নবমীর। ভাজনী গাঁও ছাড়িয়ে কাসা গাঁও, মাঝে ছোট মাঠ। বুধরাম বোধ করি ভেবেছিল নবমী আজ ঘরেই যাবে। ভাজনীর ধারে এসে সে ডাইনে পা বাড়ায়। বুধরাম বলে—ঘরকে নাই যাবি? হুথা একেলা—। বড় ভারি গলাটা। আজ নবমীর মনে হচ্ছিল বুধরামের গলাতে সেই দিন যেন বড় মমতা মিশান ছিল। জবাব কিছু করল না নবমী, তবু ডাইনেই পা বাড়িয়ে দিল।

বুধরাম সংগে এগিয়ে চলে, বোধ হয় পৌঁছে দেবে ইচ্ছা ছিল।

তু যাঃ। একেলাই যাব হামি।—অতি সোজা কথা কয়টা বোলে সে জোরে পা চালিয়ে দেয়। বুধরাম কী মনে করল! সেই দিনের পরে থেকে সে এক রকম আসা যাওয়া ছেড়েই দিয়েছে।

সুন্দর এগিয়ে গেল বুধরামের সংগে! তার বাড়ি যাওয়ার পথ শম্ভুর বাড়ির পাশ দিয়ে। তাই না গিয়ে একটু এগিয়ে মাঠের ধার দিয়ে ঘুর পথে গেল সুন্দর। বড় ভালো লেগেছিল তাতে নবমীর সুন্দরকে; আদৎটা তার বড় লায়েক মনে হোল তার।

তখন সন্ধ্যা পেরিয়ে গিয়েছিল। ফুট্‌ফুটে জ্যোছনা ছড়িয়ে পড়েছে পৃথিবীতে, ফুর্‌ফুরে হাওয়া। মাঠের ধার দিয়ে পথ। নবমী দূরে তাকায় দূর আকাশের গায়ে। দূরে দূরে গাছের মাথায় মাথায় চাঁদের আলো। কিসের যেন কি এক স্পর্শ লাগে;

অনেকক্ষণ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল নবমী উন্মুক্ত আকাশের নীচে অসীম দিগন্ত। একটা মুক্তির নিঃশ্বাস মুক্ত কোরে দিয়ে এগিয়ে গেল বাপের ঘরের দিকে।

কেটে গেল রাত, কাটল দিন! দিনের পরে দিন, মাস, বছর ঘুরে এল। কিন্তু মুক্তি কই, কত দূরে! ছেলেমেয়ে দুটোর জন্য আজও পোড়ে আছে এই লক্ষ্মীছাড়া বাড়ির এই ছন্নছাড়া পরিবেশে। একলার জীবন, একাকী দিন কাটানো। পারে না আর, হাঁপিয়ে উঠেছে নবমী।

ভগবান মানুষের ভালোই করেন—বলেছিল দোস্ত! দোস্তর কথা কি মিথ্যা হোতে পারে?

কিন্তু ভালো তার কোথায় হল? অনেক ভালো চায় নি তো ভগবানের কাছে কখনও! সে চায় কেবল ছেলেমেয়ে দুটোকে তার কাছে পেতে। তারপর সে বেরিয়ে পড়ত অনন্ত পৃথিবীর অশেষ পথ ধোরে।

আজ আবার বার বার দোস্তকে মনে পড়ছে। বলেছিল দোস্ত—দুনিয়াটা তো এইটুকু নয় রে পূর্ণিমা! সে এই বিপুলা পৃথিবীর একটা কোণে একটু জায়গা বেছে নিত। খারাপের ভেতর দিয়েও ভালো আসে—বলেছিল দোস্ত। কিন্তু আর কী-ই বা খারাপ হতে পারে তার! কই ভালো তো আসে নি কোন দিক থেকে! ছেলেমেয়েকে যদি পেত, তবু ছিল একটা শান্তি! তারপর ভাল হোক মন্দ হোক সে একবার যুঝে দেখত। আর তাই যদি না-ই পেল! হায়! ভগবান! তবে মরণ দাও! এমন কোরে নিঃসংগ অনর্থ জীবন আর টেনে টেনে চলতে পারে না সে! তবে—।

মনে পড়ে সুন্দর বলেছিল সেই দিন—আর কেনে ভাবিস্ নম্‌মী ! হাঁ, কেনই বা ভাবনা-চিন্তা আর তার ?

পারে পারে সে সুন্দরের আশা পুরণ করতে ; পারে সে সাংগা করতে তাকে। তাতে বেআইনী হবে না, কেউ কোন কথাও বলতে পারবে না। বুধরামেরও আর আপত্তি নেই ! বলেছে সে সুন্দরকে—উয়ার অমন শুকনো মুখখানা ভারি দুঃখায় মন। হামার ঘর নাই করবে যদি দোসরা মোটা লিক্ না কেনে ?—আর বলেও যদি সে কিছু, সুন্দর দেনা শোধ কোরে দিতে পারে। সেই ক্ষমতা তার আছে।

সুন্দরও বারবারই বলছে—ইঠ্ঠ বেয়া তো কিছু নাই না আহে ?

না, তা নেই। কিন্তু—!

কিন্তু কী ?—ভাবে নবমী। তবে আর হাঁড়িয়াতে দোষ কি ? দোষ তো নেই-ই। তবে টগরিয়ার দোষ কি ? কে বলে টগরিয়ার দোষ আছে। এ আক্‌ছার হচ্ছে, ওতে আর দোষ কোথায় ! তবে মা ? মাও বা খারাপ কি করল ! বুকটা টন্ টন্ কোরে ওঠে। মনে পড়ে তার বাবার কথা। হু-হু কোরে কান্না পায় নবমীর।—নাই, নাই, নাই দরকার হামার অমন সুখে !—তার কাছে দেহটাই শেষ কথা নয়। পুরুষের সংগ পাওয়াই তার পরম পাওয়া নয়। সে চায় আলো। আলোর রোশনাই সে দেখেছে দোস্তর মুখে, আলোর ঝিলিক দেখেছে সে শ্বশুরের চোখে। চায় সে আলো। মুখ চোখ তার শুকনো কেন ? কে বুঝবে কেন ? অন্ধকার সে সইতে পারে না ; আলোর দিকে যেতে চায়, কিন্তু

পারছে না যেতে। তার পায়ে যে বাধার শিকল! বাধা কোথায়? ঐ তো ভিতরকার মা-টা কিছুতেই মরছে না। ঝড়ের তাণ্ডবের দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবে—ভগবান! তোমার বজ্র একটা পাঠিয়ে দাও না, সাফ কোরে দিয়ে যাক আমায়! আলো যদি না-ই দেবে, তবে, আলোর একটা তুমুল ঝলকানিতে চির-অন্ধকারের বুকে মরণের মাঝে ঠেলে ফেলে দাও না কেন?

আকাশ চিরে একটা বিজলী খেলে গেল; নবমীর চোখে ধাঁধাঁ লাগে। চমকে ওঠে সে; মনে পড়ে—দোস্ত বলেছিল মরণ কামনা করা পাপ। পাপই তো! মানুষ জন্ম দুর্লভ জন্ম। মানুষকে অনেক কাযের ভার দিয়ে পাঠান ভগবান, সে কাজ শেষ না হোলে মরণ হয় না; চাইলেই মরণ হয় না।—এমন আরও কত কথা বলেছিল দোস্ত। তবে? তবে সে কী করে বা এখন!

যেমন বাতাস, তেমন বর্ষা, ঘন ঘন বিজলী চমকায়, আর মেঘের গর্জন। কানে তালা লাগে। এই বর্ষণ, তার মাঝে ঐ কে? সুন্দর না?

হাঁ, সুন্দরই তো! তুফান-বর্ষণে বোধ হয় অপেক্ষা করেছিল এতক্ষণ। কিন্তু বৃষ্টি থামার লক্ষণ নেই। আর অপেক্ষা করা চলে না, সন্ধ্যাও যায় যায়। মাঠের মধ্য দিয়ে কোণাকুণি পথ ধরেছে সে—মাথায় টোকা, কাঁধে নাংগল; তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে আগে আগে গরু দুটা। ইস্! ভিজে একশা; টোকায় কি মানায় এমন বর্ষা! বড় মায়া হয় নবমীর। এখনও যেতে হবে তাকে আধপোয়া ক্রোশ পথ—এই খোলা মাঠের মধ্য দিয়ে।

ডাকবে নাকি? ইতস্ততঃ করে সে। মানুষটা চোখের উপরই তো এমনই গরুভেজা ভিজে যাবে! মনে তার দোলা লাগে, প্রা! লোমকূপে জাগে শিহরণ।

জীবনের প্রথম অরুণোদয়ে অন্তরংগতায় প্রায় অদোসর ছিল ঐ সুন্দর। একদিন ছিল যখন সুন্দরের সংগ পেলে আর অন্য কিছু তার মনেও পড়ত না, ভালোও লাগত না; খাওয়া ভুলে যেত—। কেন ভুলে যেত মনে নেই তা সেই বালিকা বয়সের কথা। তারপর এল কৈশোর, কৈশোরে সুন্দর এল তার জীবনে নবরূপে, নূতন ভাবে, নবীন প্রেরণা সংগে নিয়ে। সাহচর্যে অন্তরংগতায় সুন্দরের স্থান অপূরণীয় হোয়ে উঠেছিল। সুন্দর ভালো, সুন্দরের সব ভালো। তার চলা ভালো চলন ভালো বলা ভালো। ভালোর সবই ভালো। সুন্দর ভালো, তার সবই নিখুঁত।

এল যৌবন; এল নূতনতর ভাব ভাবনা আবেগ আবেশ। তখনই সুন্দরের ঠাঁই হোয়ে গিয়েছিল একেবারে বুকের মধ্যে; সুন্দরকে না-দেওয়ার নবমীর কিছুই রইল না। দিয়েছিলও বুঝি সবই উজাড় কোরে। ছুটে যেত সুন্দরের ঘরে, সব গোপন কথা রেখে আসত সুন্দরের কাছে। একটা ডাঁসা পেয়ারা পেলেও সুন্দর ছুটে আসত; আধ কামড় নবমী খেত, তবে বাকীটা খেত সুন্দর। আজ তার স্পর্শ জাগে সর্বাংগে; কেঁপে ওঠে নবমী। আহা! সেই সুন্দর!

ডাকবে? নিজে হাতে কাপড় দিয়ে মুছে দেবে সুন্দরের দেহটা! কী দোষ? একটা দিন একটা মানুষকে যত্ন করলে আর দোষ কিসে! মানুষে-ই তো মানুষকে যত্ন করে! আর এ তো

সুন্দর! একদিন সবই তো দিয়েছিল মনে মনে তার যা কিছু ঐ সুন্দরকে। চোখ বোজে নবমী। আঃ! আজ ভাবতেও কি সুখ সেই দিনগুলোর কথা। কেমন সুখ-স্পর্শ জাগে নবমীর দেহমনে। হাত ছানি দিয়ে ডাকে নবমী—হেই সুন্দর!

কিন্তু কই সুন্দর? চোখ খুলে দেখে নবমী সুন্দর পথের বাঁক ঘুরে গিয়েছে, আর দেখা যায় না তাকে। একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল নবমীর বুক ঠেলে। কত মনোরম ছিল সেই দিনগুলো। ঐ পথের বাঁকে, ঐ ঝোপের আড়ালে আড়ালে কত তাদের কথা, কত মন দেওয়া নেওয়া হোয়ে গিয়েছিল। সে আজ কতদিন আগে! তখন সুন্দর বই কাউকে জানত না সে; আর কাউকে বলতে পারেনি তার সব কিছু কথা অসংকোচে। অথচ আজ সেই সুন্দরই কত দূরের—কত-দূরের মানুষ! যার চাইতে আপন আর কাউকে ভাবতে পারত না একদিন, সে-ই আজ পর—একেবারেই পর হোয়ে গেছে। যার সংগে দেখা হলে সুখভোগ হত, যাকে ছুঁতে পুলক-শিহরণ জাগত, তাকে আজ একটু ডেকে আনতেও পারলে না সে; সংকোচে দ্বিধায় সব এলোমেলো হোয়ে গেল। ভাবে এই তো তার ভাগ্য। নইলে অমন তন্ময় হোয়ে পড়েছিল কেন একবার ডেকে আনবে ভেবে! আহা! বেচারার কেউ নেই আজ আপন বলতে! যদি একটু আগে ডাক দিত সে! এখন ঘরে যাবে, নিজেরটা নিজেই কোরে নেবে। নেই তো নইলে এমন তাকে গামছাখানা এগিয়ে দেয়, এনে দেয় এক ঘটি জল, চা-টুকু দেয় কোরে। সবকিছু নিজে হাতে—নিজে-হাতেই তাকে কোরে নিতে হবে।

যাবে নাকি সে টোকাটা মাথায় দিয়ে! এই তো, এইটুকু তো পথ! গাঁওয়ের লোকে গাঁওয়ের লোককে কোরে দেয় না! দোষ কি? পড়শীকে পড়শী একটু গরম জল তৈরী কোরে দেবে, তাতে দোষ তো কিছুই নেই! নাঃ দোষ নেই কিছু। যাবে সে, যাবে। আকাশের দিকে তাকায় নবমী।

এখনও কালো মেঘে ঢেকে আছে আকাশ; মাঠে বৃষ্টি পড়ছে ঝম্-ঝম্-ঝম্। সন্ধ্যা পেরিয়ে গিয়েছে, অন্ধকারে ছেয়ে গিয়েছে চারিদিক। আকাশে-পাথারে-মিশে একাকার। হু-হু দমকা বাতাস তখনও বইছে। যাবে, তবু যাবে নবমী। সুন্দরের জন্য আজ মনটা কেন যেন বড় বেদনার্ত হোয়ে উঠেছে। কিন্তু—।

ভাবতে থাকে নবমী। কী ভাবে? এমন দুর্যোগের রাত্রি, যাবে সুন্দরের ঘরে! সে আর কিছু ভাববে না তো? থেমে যায় নবমী। ছেলেমেয়ে দুটো আছে তার। এখনও আশা আছে। তার মন বলে পাবে, পারবে সে ওদের দুটোকে নিয়ে আসতে। আর ভাবলও বা। যা খুসী তা ভাবুক সুন্দর। সে যদি ঠিক থাকে! বন্ধু, বাল্য বন্ধু!

মনে পড়ে দোস্ত বলেছিল—ইচ্ছার মত তাকৎ দুনিয়ায় আর কোন কিছুর নেই। পাবে পাবেই ছেলেমেয়ে, পারবে তাদের নূতন কোরে গোড়ে তুলতে। তা সুন্দর, শত সুন্দর এলেও রুখতে পারবে না। আর সবটাই তো তার নিজের এক্তিয়ার! যাবে সে; একদিন একটু যত্ন আত্তি কোরে আসবে সুন্দরকে; জীবনের সাধ একটা দিন অন্ততঃ পুরণ করবে। তা যে যা-ই ভাবে ভাবুক। বেতর করবে না কিছু কোন দিন সে। এটুকু বিশ্বাস সে সুন্দরকে

যদি করতে না পারে তবে আর কি জানল কি চিনল তাকে সে এতদিনে ?

মনে পড়ে আদালত থেকে ফিরতে সুন্দর ঘুরপথে গিয়েছিল তার বাড়িতে। যদি তা না যেত, যদি সোজা পথে নবমীর ঘরের ধারে দিয়েই যেত সে তবেই বা কার কী বলার ছিল! সেই দিন সেই দুঃখের সময়ে সুন্দর তার ঘরে এসে বোসে দুটো কথা বোলে গেলেই বা দোষের কি ছিল! কিন্তু সে তা করে নি! যা-ই যে বলুক, সুন্দরের চাল-চলনের মধ্যে কোন রকম ক্রুটী নেই। তাই তো তাকে এত ভালো লাগে।

যাবে, কৈশোর থেকে যে সাধ যে আশার স্বপ্ন দেখেছিল, তার একটা টুকরা অন্ততঃ সে আজ দেবে আর নেবে। অন্য কিছু নয় বন্ধু হিসাবে। হাসে নবমী মনে মনে—দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাবে! হাঁ, তাই মেটাবে, মনের সবগুলো আবেদনকে কেবল মেরে মেরে লাভ কি তার! দুনিয়ায় দিল সে সব কিছু; পেল না কিছুই। পেয়েছে চায় নি যা তাই। তবে আর অন্যকে ঠকাবে কেন? ধীরে ধীরে টোকাটা মাথায় তুলে নেয়।

সোজা উঠে আসে দাওয়ায় বুধরাম, নবমীর পাশে গা ঘেঁসে দাঁড়ায়—কাঁহা চল্‌লি রে এই তুফান বরখালে, নম্‌মী?

চমকে ওঠে নবমী। এ আবার ঠিক এই সময়ে কোত্থেকে? মনে মনে বিষম বিরক্তি বোধ করছিল সে।—বেইমান কাঁহিকে! ধীর গম্ভীর গলায় বলে—কেনে, হামার কি কাম নাই খে কুছু? —টোকাটা মাথায় চাপিয়ে সে আংগিনায় নেবে পড়ে। কিন্তু বেরিয়ে গেল না বাড়ি থেকে। রান্নার চালাতে গিয়ে ঢুকল।

বুধরাম দাওয়ায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল। বাতি জ্বালিয়ে চুলোতে আগুন দেয় নবমী। তারপর জল গরম বসিয়ে দিয়ে বাতি নিয়ে বেরিয়ে এল।

—যা ভিতরে যা। এঃ একদম ভিং-এ আইলি! কেনে, মাইকিঠু কাঁহা না কাঁহা রহলে বরখা রাতেলে দেখাব হৈ?—দাঁতে দাঁত চেপে বলে নবমী।

বুধরাম বলে না কিছু; নবমীর পিছু পিছু এসে ঘরে ঢোকে।

দূরে থেকে ছুঁড়ে দেয় গামছাটা তার দড়ির উপর থেকে বুধরামের গায়ের উপরে।—লে, জানঠো মুছে লে দৈ। এখনি নাই আলে নাই হত?—বেরিয়ে গেল আবার নবমী।

বুধরামের মুখে কথাটি নেই; সুবোধ বালকের মত গামছাটা তুলে নিয়ে মাথা গা মোছে। এমন মমতার স্পর্শ অনেক দিন পায়নি বুধরাম, নবমী বাড়ি থেকে চোলে আসার পরে থেকে ওসবের পাট তার ঘুচে গেছে। আর করবেই বা কে? টগরিয়া তো আর নবমীর মত ভদ্রমানুষের ঘরের ভালমানুষী দেখেনি! পুরুষকে কেমন কোরে ভালবাসতে হয়, কিভাবে যত্ন করতে হয় সে জানবে কোত্থেকে? বোসে বোসে দুই হাঁটুর মাঝে মুখটা গুঁজে ভাবছিল সাতপাঁচ এইসব বুধরাম।—নমমী তরে মাইকি কাঁহা মিলবেক, ঘরকে লছমী! খালি ঘরে নিজে নিজে বলছিল বুধরাম বিড়্‌বিড়্‌ কোরে।……তা বুধরামের ভাগ্য!—লছমী থাকবে কেনেকে?

লে, পানি পি-লে।—চায়ের বাটিটা এগিয়ে দেয় নবমী বুধরামের সামনে।

বুধরাম মাথা তোলে। গরম চায়ে থেকে ধোঁয়া উঠছিল বুধরামের চোখের সামনে কুণ্ডলি পাকিয়ে। কেন যেন বড় বড় দুই ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল চোখ থেকে, হাতের পিঠে মুছে ফেলে তা বুধরাম নিজেই।

—কান্‌ছিস্ কেনে রে?—ভিজে গলায় প্রশ্ন করে নবমী।

—নাই, ঝুট্‌মুট।—চায়ের বাটিটা টেনে নিল কাছে।—তুয়ার পানিঠু?—শুধায় নবমীকে।

—তু পিয়ে তো হামকে দে।—ভাবাবেশ পূর্ণ চোখ দুটো তুলে ধরে বুধরামের চোখে।

খুসীতে মন ভোরে ওঠে বুধরামের। তাড়াতাড়ি কোরে খানিকটা খেয়ে এগিয়ে দেয় বাটিটা নবমীকে।

—আরু থোরা পি লে।—অনুরোধ করে নবমী;

—তু থোরা পি, পিছে।

নবমী বুধরামের অন্তরংগতা বুঝতে পারে। বাটিটা হাতে তুলে নিয়ে শুধায়—ছানা দুটো, লোড়া ছোয়ালী? উয়ারদেরকে—

কথা শেষ হবার আগেই উত্তর করে বুধরাম।—ভাল্-এ আছে।—খুব কাছে সরে গা ঘেসে বসলো; ডাকে—নম্‌মী!

—কেনে?

আর কিছু বলে না বুধরাম। কেবল মাটির দিকে চেয়ে চেয়ে নিজের পায়ের নখ খুঁটছিল। চোখে তার করুণ আবেদন।

কেনে? বল না রে? লে পি লে।—বাটিটা আবার এগিয়ে দেয়।

একটু একটু কোরে চা-টুকু নিঃশেষ কোরে উঠে দাঁড়ায় বুধরাম।

—কেলে বুলাইছিলি ?

বুধরাম কিছু বলে না ; মুচকি হেসে দরজার দিকে পা-বাড়ায়।—বরখন থামিল্ এতিয়া যাব লাগে।—নিজে নিজেই বলল কথা কয়টা। তারপর বেরিয়ে নামে সে আংগিনায়।

নবমী এগিয়ে এল পিছু পিছু দরজা পর্যন্ত। হেলে-দুলে এগিয়ে গেল বুধরাম। ক্রমে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল বুধরামের দেহটা। তখনও বাইরে ঝির্‌ঝিরে বৃষ্টি পড়ছিল। বাতাসটাও দমকা বোয়ে চলছিল একটু পরে পরেই। হঠাৎ মনে হল নবমীর সে এসেছিল দেখতে নবমী ঘরে আছে কিনা, একাই আছে কিনা। একটু আগে তার একথা মনে আসে নি। এলে আজ তবে একটা কুরুক্ষেত্র বাঁধিয়ে দিত সে। দরজার পাল্লাতে হেলান দিয়ে ভাবছিল নবমী। —কি ছোট মন এই পুরুষগুলোর। ওর ঘরে থাকতে পারল না, তা বোলে একলাই থাকবে এমন কড়ার করেছে কি সে ?—দাঁতে দাঁত ঘষে, রাগে সর্বদেহ তার গজ্-গজ্ করছিল।—দ্বিতীয় পুরুষ যদি সে গ্রহণই করে, তবে বুধরামের বলারই বা কি আছে ?

সত্যই তো, অন্য পুরুষের ঘর যদি সে করতেই যায় কারুর কিছু বলার নেই। পঞ্চায়েতও তাতে ঠেকাতে পারবে না। পঞ্চায়েত কোরে তার শিশু সন্তান বুকে থেকে কেড়ে নিল ; ওর কথা তো তখন ওঠে নি ! তবে আর বুধরামের কী-বা দাবী আছে তার উপরে ? কোনই দাবী নেই। থাকলে তখনই উঠত সেই প্রশ্ন। এখন সে যদি অপরের সংগে বাসও করে, বুধরামের তাতে কিছু বলার থাকে না, তার কাছে ওর একটা কাণাকড়িও দাবী করার নেই আর আজ।

—বেইমান!—রাগে দুঃখে নিজে নিজেই গজরায় নবমী।—সুন্দরলে কুঁদ্‌তে আইল, যেনেক উয়ার খাইপরি!—চোখ দুটো থেকে যেন আগুন ঠিকরে বেরুচ্ছিল।

সত্যই তো ভাতকাপড়ের খবর নেই, তো তাড়না করবার বেলা এলেন পুরুষ। রাগ বাড়ে তার। কোথায় চলছিল সে সুন্দরের কাছে; বেচারা ভিজে তিতে একশা হোয়ে ঘরে ফিরল। পুরনো বন্ধু, অতি অন্তরংগ বন্ধু তার। ভেবেছিল যাবে; গিয়ে দুটো পুরনো কথা দুটো মিষ্টি আলাপ কোরে আসবে। তাই না এসে—ভণ্ডুল যত! তাই নয় তো কি! কিন্তু ওর খায় সে না ওরটা পরে! তবে অত খবরদারি কিসের? ওর কী তোয়াক্কা রাখে নবমী?

যাবেই সে সুন্দরের ঘরে। যেখানে ইচ্ছা সেইখানেই যাবে সে! তাতে ওর কি? যাবেই তো; এখনই যাবে। আর ঐ সুন্দরেরই ঘরে যাবে।—অন্ধকারে দাঁড়িয়ে একা একাই যেন বাতাসের সংগে ঝগড়া করছিল নবমী। যাবেই তো, সারারাত আজ সুন্দরের ঘরে থেকে আসবে। দেখবে সে বুধরাম তাকে কী-বা করতে পারে!

ঘরের ভিতরে থেকে টোকাটা নিয়ে বেরিয়ে এল। যাবেই সে সুন্দরের ঘরে, এখনই যাবে। তার কি আর জীবনে ইচ্ছা-বাসনা নাই! তার কি নিজের বলতে কিছু নেই! থাক্ গে রান্নাবান্না। হাঁড়িই চড়াবে না সে আজ নিজের ঘরে।

উনানের ভেতরকার কাঠগুলো টেনে বার কোরে জল ঢেলে দেয়। ফুঃ—ডিব্‌রিটা নিবিয়ে দিয়ে বেরিয়ে আসে—রান্না ঘর থেকে, বাড়ি থেকে।

সুন্দর, অ সুন্দর !—সোজা ভিতরে ঢুকে যায় নবমী।

চমকে ওঠে সুন্দর। একি সে স্বপ্ন দেখছে ? সমস্ত শরীরের মধ্য দিয়ে একটা তড়িৎ-স্পন্দনের মত শিহরণ বয়ে গেল তার। দেহের প্রতিটি অংগ প্রতিটি লোপকূপে যেন কেমন একটা প্রচণ্ড তাণ্ডব তুলে চলছিল। এত কাছে আজ নবমী! একেবারে তার নির্জন নিঃসংগ কুটীরে! সুন্দরের মন চাইছিল সাপটে তুলে নেয় নবমীকে বুকে, একান্তভাবে মিশিয়ে দেয় দেহের সংগে দেহ তার। এগিয়ে গেল সে, যেন বাতাসে উড়ে গেল ; মনটা দেহটা যেন এমনই হালকা হোয়ে উঠেছে।

আঃ !—সুন্দর ! কথ-অ-দিন পরে ! আ-আঃ।—বুকের সংগে মিশে গেল নবমী।—আর ! সর্বাংগে যেন তার কেমন মধু-স্পর্শ বোধ করে। মানুষের স্পর্শ এত মিষ্টি ! মুখ তুলে ধরে মুখের কাছে নবমী ; ফিস্‌ফিস্ কোরে বলে—সুন্দর ! হামনিকে সুন্দর।

নির্বাক স্পর্শ-সুখে উন্মাদ হোয়ে ওঠে দুটি মন, ধমনীতে ধমনীতে তাণ্ডব খেলে গেল, উল্কার বেগে ছুটে চলল রক্তের প্রবাহ। চোখ বোজে নবমী। সুন্দর আরও নিবিড় কোরে ধরে নবমীকে। আবেশে শিথিল হোয়ে এল নবমীর দেহ-মন।

যেন হারানিধি পেল দুজন-দুজনকে।—সুন্দর! হামার সুন্দর—!

—নম্‌মী ! নম্‌মী হামনিকে !

আঃ, কি প্রাণ মাতানো ডাক। আরও যেন নিবিড় হোতে চায় নবমী।—আঃ। নাই—হাঁকাইবি ! ভারি জ্বলছিল কলজাটা, ঠাণ্ডা হব লে দে সুন্দর !—বিড় বিড় কোরে বলে নবমী। কেঁপে

কেঁপে উঠছিল সর্বাংগ তার বারবার সুন্দরের বুকে। কি এক অননুভূত লজ্জায় মুখখানি তার অলক্ত রাগে উদ্ভাসিত হোয়ে উঠেছিল ; আঁখি পাতে রাজ্যের সরম নেবে আসে, আবেগ-বিবশ চোখ দুটি বুজে এল।

আরও নিবিড় কোরে ধরে সুন্দর নিজের বুকে নবমীকে! ঘামে ভিজা কপালটাতে গাল চেপে সুন্দরও চোখ বোজে।—হামার-এ নম্‌মী রে!—অস্ফুট শব্দ, অস্পষ্ট কথা কয়টা তার অনুচ্চ কণ্ঠে বেরিয়ে এল!

*   *   *   *

ছোট্ট জানালা দিয়ে এসে চাঁদের আলো পড়েছিল নবমীর মুখে চোখের উপরে। চোখ খুলে তাকায় নবমী। বর্ষণের পরে সবে উঠেছে চাঁদ। আবছায়া যতই হোক তাতে অরুণের আলোর ঔজ্জ্বল্য রয়েছে। চারিদিকে পাখী প্রহর ডাকে, বুঝি চাঁদেব আলোর স্পর্শে তারাও ঘুম ভেংগে জেগে উঠেছে। কিসের একটা পুলক স্পর্শ জাগে নবমীর দেহে, আবেশে চোখ বোজে আবার। কিন্তু কেমন যেন, বোধ করি একটা অস্বস্তি বোধও রয়েছে সংগে। আবার চোখ খুলে তাকায়।

সুন্দরের বুকের উপরে তার মাথা। ধড়ফড় কোরে উঠতে যায় নবমী। কিন্তু পারল না। সর্বাংগে উচ্ছৃংখলতার অবসাদ ; হাত-পা-চোখ যেন জড়িয়ে জড়িয়ে আসছিল। তবু জোর কোরেই উঠে পড়ে সে, গন্ধটা যেন অসহ্য। অসংযমের চিহ্ন রয়ে গেছে উভয়ের দেহে। কেমন একটা পুলক-শিহরণে দেহ-মন তবু নেচে

নেচে উঠছিল। কিন্তু উঃ কি বিশ্রী গন্ধ! লাফ দিয়ে উঠে পড়ে সে—বুঝি ভোর হোল!

ঘরের মেঝেতে হ্যারিকেনটা জ্বলছিল; হাঁড়িয়ার হাঁড়িটা মাঝখানে উপুড় করা রয়েছে। পাশে রয়েছে একটা খুঁড়ি। ইস্, সে-ও খেয়েছে নাকি! উঃ, কি বিশ্রী গন্ধ সর্বাংগে, ঘরময়, কিন্তু—।

হেই সুন্দর! ঘর যাব।—ছুটে বাইরে যায় নবমী—বুঝি ভোরেরই পাখী ডাকছে।

আকাশে তাকায়, তাকায় উন্মুক্ত প্রান্তরের দিকে। কিছু বুঝতে পারে না। পাখীগুলো একটার পরে একটা ডেকেই চলেছে।

কিন্তু গন্ধটা বড় তীব্র! উলটে আসে যেন পেটের ভিতরকার সব কিছু। ওয়াক্! ওয়াক্! উপবাসী পেট থেকে খানিকটা পিত্ত বেরিয়ে এল। ওয়াক্! সর্বাংগে মায় নিশ্বাসের মধ্যেও উগ্র গন্ধটা রয়েছে যেন। কেমন একটা অস্থিরতা বোধ করে দেহে, আর্ত হোয়ে ওঠে মন। ছুটে যায় ঘরে আবার।

হেই সুন্দর! উঠ ঘর যাব হামি!—ধাক্কা দেয় নবমী—উঠ, উঠ!

সুন্দর কিন্তু পাশ ফিরে শোয়; কি যেন বলে বিড়্বিড়্ কোরে। কী বলে বোঝা যায় না। কিন্তু উঃ! অসম্ভব গন্ধ ওর মুখে! লাফ্ দিয়ে সরে যায় নবমী সুন্দরের কাছে থেকে। কিন্তু গন্ধটা ঘরময় ছড়িয়ে আছে যে!—ওয়াক্, বাইরে যায় মুক্ত বাতাসে, হাঁপ ছাড়ে গিয়ে। ঘরে আসে ফিরে আবার; কেমন যেন বড় অসহায় বোধ করছিল নিজেকে নবমী। জানালা দিয়ে বাইরে

তাকায়। ভোরই হোল বুঝি! পাখীগুলোর ডাকার তো বিরাম নেই! দুই হাতে ধোরে প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে সুন্দরের কানের কাছে মুখ নিয়ে ডাকে। কিন্তু গন্ধটা যে বরদাস্ত করতে পারছে না! পেটের নাড়িভুঁড়ি যেন বেদনা কোরে বেরিয়ে আসে। আসুক! প্রাণপণ করে সে, জানালা দিয়ে তাকায় পূব আকাশে দূর কিনারায়।

হেই সুন্দর! উঠ, উঠ, ঘর যাব হামি; ভোর হলেক, উঠ! —প্রাণপণ ঠেলতে থাকে সুন্দরকে।

ওঠে না সুন্দর, বারবার হাত বাড়িয়ে কেবলই জড়িয়ে জড়িয়ে ধরতে চায় নবমীকে; বিড়্‌-বিড়্‌ কোরে বলছিল—মংগলা দিলেক, বলে দিলটা খুসী রাখবেক।—যত সুন্দর কথা বলে ততই গন্ধ বেরোয়। সইতে পারে না নবমী। সোরে যায়, আবার এসে ঠেলে—সুন্দর! হেই সুন্দর, উঠ। জানালা দিয়ে বারবার তাকায় বাইরে।—উঠ না রে!—আকুতি তার ঘরের দেয়ালে প্রতিধ্বনি তোলে।

হাই তুলে গা-মোড়া মেরে উঠে বসে সুন্দর। পিঠ ধোরে দোলা দিয়ে মিষ্টি কোরে বলে নবমী—ভোর হৈ গোল, এখ্‌নি ঘর যাব লাগে হামনিকে, সুন্দর, অ সুন্দর!—একান্ত মিনতি তার কণ্ঠে।

ফিরে তাকায় সুন্দর পেছনে নবমীর দিকে। কি দেখল সে কি বুঝল, উঠে পড়ে ঝট্‌ কোরে।—ভোর হৈ গোল?—মেঝে থেকে হাঁড়িটা ঘুরিয়ে সোজা কোরে তুলে নেয় হাতে।—মংগলাসে লান্‌লি কালি।

হাঁ, লই যা, লই যা।—ব্যস্তভাবে বলে নবমী।—বাহার রাখি দে।—জানালা দিয়ে তাকায় আবার বাইরের আকাশে।

টল্‌তে টল্‌তে বেরিয়ে আসে সুন্দর। নবমীও পিছু পিছু এল। সুন্দর টল্‌তে টল্‌তে ফিরে যায় আবার ঘরের ভিতরে। আকর্ষণ করতে চায় নবমীকে—কাঁহা যাবি হামনিকে ছোড়ে।

নাঃ, ওর আর ভরসা করা যায় না। একলাই যাবে সে। ঐদিকে বুঝি আবার ভোর হোয়ে এল।

সুন্দর হাতের হাঁড়িটা বুকে জড়িয়ে ধোরে শুয়ে পড়ে মেঝেরই উপরে।—হামাব নম্‌মী! হামনিকে জান!—চুমু খায় হাঁড়িটার গায়ে।

উঁকি দিয়ে দেখল নবমী। কশাঘাতের বেদনা বোধ করছিল সে। ত্রস্ত পদে ছুটে বেরিয়ে গেল গৃহ-গণ্ডীর বাইরে। পোড়ে রইল সুন্দর মেঝেতে অচৈতন্য।

বাড়িব নীচে মাঠ। মাঠের ভিতর দিযে পথ। পথে দাঁড়িয়ে শূন্যে আকাশে তাকায় নবমী। একটা গভীব নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল তার বুকঠেলে। নাই, নাই, কিছুই রইল না তার। এই অসীম অনন্ত বিশ্বে সে নিঃসম্বল নিঃস্ব। কেমন যেন বেদনা বোধ করে সে। হায়! হায়! শেষে কিনা—। কেমন ঘেন্না লাগে; দেহটা যেন অপবিত্র হোয়ে গেল। মনে পড়ে দোস্ত বলেছিল—দেহটা নোংরা হোলে মনটাও সেই আবহাওয়ায় নোংরা হোয়ে যায় রে পূর্ণিমা? আর মনই যদি গেল তবে আব মানুষের রইল কি?

চোখ জ্বালা করে নবমীব; বুক ফেটে আকুল কান্না বেরিয়ে আসে; সমস্ত দেহটাতে যেন দহন-যন্ত্রণা বোধ করতে লাগল। ছুটে এল সমস্তটা পথ। ঘরের ভিজে দাওয়াতে উপুড় হোয়ে পোড়ে মাটির সংগে বুকটা মিশিয়ে দিল সে! মাথা কাত কোরে গালটাকে মাটির বুকে ঢেলে দেয়।

আঃ! কি শান্তি! হু-হু কোরে দুই চোখ গড়িয়ে অশ্রু ঝোরে পড়ে। কেবলই বড় কান্না পাচ্ছে আজ নবমীর। এই কী করল সে! দোস্ত! বলেছিলে তুমি মন খাঁটি যার মানুষ সে-ই খাঁটি। মন তো আমার খাঁটি-ই ছিল। কিন্তু—ভাবতে পারে না সে, মাথা যেন ঝিম্-ঝিম্ করে।

কতক্ষণ পোড়ে ছিল এমন নির্জীব হোয়ে বলতে পারে না। হঠাৎ মনে হোল কে যেন হেঁটে চলছে দাওয়ার উপর দিয়ে; পায়ের শব্দ গেল কানে। কে? কে আর হবে?

মাথা তোলে নবমী। আকাশে তাকায়। না, ভোর তো হয়নি! পাখীগুলো সব আবার ঘুমিয়ে পড়েছে, চারিদিক নিঝুম। কিন্তু কি সুন্দর জ্যোছনা! রূপলী আলোর তরংগ যেন উছলে পড়ছিল দিকে দিকে।

কেউ না। অমনি মনের ভুল; বুঝি ছেলেমেয়ে দুটোর কথা ভাবছিল সে। ভাবতে ভাবতে তন্দ্রার ঘোরে শুনেছিল বোধ হয় তাদেরই পায়ের শব্দ। আসছে ভাই-বোন; আসছে হারানিধি, বুকের মাণিক দুটি; আসছে তারা পায়ে পায়ে। এগিয়ে দিয়ে গেল বুধরাম—অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে—যা মায়ের কাছে! টগরিয়া লাঠি হাতে ঘুরে মরছে বাড়িময়—কাঁহা গেলেক ছোকরা-ছুক্‌রী দুঠো, জান নিকলাই দিবি। সুন্দরকে ঘর ছিনলেক মাইঠু!

পালিয়ে আসছে ছেলেমেয়ে দুটো, তাদেরই পায়ের শব্দ। কিন্তু কই? না তো! নির্জন প্রান্তরে শুধু চাঁদের হাসি, চাঁদের হাসি লুকোচুরি খেলছে গাছের ফাঁকে ফাঁকে ঘরের আনাচে

আনাচে, হাসি ফেটে পড়ছে আংগিনাময়, দাওয়ার উপরে, নবমীর মুখে চোখে সর্বাংগে!

বুক ঠেলে বেরিয়ে আসে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস। আবার মাটির উপরে শুয়ে পড়ে নিরাশার অবসাদে, মিশিয়ে দেয় দেহটাকে মাটির সংগে। না, ছেলেমেয়ে হারাল সে, একেবারেই হারিয়ে গেল তারা; হারিয়ে গেল সে নিজে আর পাঁচজনের মত সকলের মধ্যে। নেই, নেই, আশা আর নেই পাবার, উদ্ধারেরও বুঝি আর উপায় রইল না। না, নিরুপায়, মুক্তি নেই, উপায় নাই। দোস্ত বলেছিল— উপায় আপনি থেকে হয় না রে পূর্ণিমা, উপায় কোরে নিতে হয়।

উপায় কোরে নিতে হয়! লাফিয়ে উঠে পড়ে নবমী; আংগিনায় দাঁড়িয়ে তাকায় শূন্যে পূবের আকাশে—একটা চাঁদের আলোই রয়েছে ছড়িয়ে, গাছের পেছন থেকে আর কোন আলোর আভাস দেখা দেয়নি পূব-আকাশে; পাখীগুলোও ঘুমিয়ে আছে। মাটিতে ছায়াটা তার নড়ে নড়ে উঠছিল, নজর কোরে দেখে নবমী ছায়াটাকে ভালভাবে। ছুটে গেল ঘরের ভিতরে—কী তার মনে হোল, কী সে ভাবল।

পরণের কাপড়জামা বদলে নিলে সে ক্ষিপ্র হাতে। বড়বাবুর মায়ের দেওয়া বাক্সটা খুলে যত কিছু ছিল ভিতরে সব বের কোরে টোপলা বেঁধে নিল। নিজের হাতে তৈরী গেঞ্জিয়াটা পূর্ণ কোরে নিল পয়সা-কড়ি যা-ই ছিল ঘরে। হ্যারিকেনটা নিবিয়ে দিয়ে বেরিয়ে আসে। টেনে দরজাটা বন্ধ কোরে নেমে এল আংগিনায়। অন্তঃস্তল থেকে কেমন যেন একটা মুক্তির নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল। মনটাতে কেমন যেন একটা নির্মুক্তির ভাব জেগে ওঠে। ভয়-ভীতি

শংকা নিরাশা কোনটাই যেন আর তাকে পংগু করতে পারবে না। নেমে আসে পথে। ফিরে তাকাল একবার বাপের ভিটার দিকে। এইবারে চোখ ছাপিয়ে নেমে আসে জল।

না-না-না, আর দেরী না ; মাথা নাড়ে নবমী প্রবলভাবে। আঁচলে চোখ মুছে তাকায় আবার পূবের আকাশে। নেই, ভোর হোতে আর খুব বেশি দেরী নেই। লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে চলে—বাপের ভিটেটা পেছনে ফেলে। দোস্তর দেওয়া, বড়বাবুর ঘরে যা-কিছু পেয়েছিল, তারই টোপলা মাথায়, কোমরে গোঁজা গেঞ্জিয়া, হাতে লাঠি আর কাটারি। বুকে তার আজ অসীম সাহস জেগেছে, দেহে বোধ করছিল অশেষ শক্তি। উপায় করে নিতে হবে নিজেকে।—বারবার কোরে আওড়ে চলছিল কথাকয়টা।

... ...

জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখে নবমী। চাঁদের আলো পড়েছে ঘরে। বুধরাম আর টগরিয়া ঘুমোচ্ছে—অঘোর ঘুম। জানালা দিয়ে এদিক-ওদিক দেখে নিচ্ছিল ঘরের ভিতরে চারিপাশ যতদূর পারছিল। কিন্তু নেই তো ছেলেমেয়ে! ঘুরে যায় পাশের ঘরের জানালায় ; মনটা দুরু দুরু করছিল। একলা ঘরে ফেলে রাখে শিশু দুটাকে! উঁকি দিতেই দেখে ভাই-বোন পাশাপাশি শুয়ে ঘুমুচ্ছে। আনন্দে বুকটা নেচে ওঠে নবমীর ; এমন আনন্দ বুঝি কোন দিন আর বোধ করে নি সে জীবনে। কিন্তু না, দাঁড়িয়ে ভোগ করার সময় নেই। বাইরে আকাশে তাকায় নবমী গাছের ফাঁকে। চাঁদ এখনও মলিন হয়নি, তবে খুব দেরী নেই ভোর হোতে। বুনট করা ইকড়ার উপরে মাটির লেপ দিয়ে পুরু করা

দেওয়াল। সেই মাটির দেয়ালের কোণা কেটে ফেলে হাতের কাটারি দিয়ে—বোধ করি এক লহমায়। সময় যে নেই, দেরী আর করা যায় না। ঐ তো পথ দিয়ে কে যেন গান গেয়ে যাচ্ছে! বুঝি চাষী বেরিয়ে পড়ল মাঠে! কাটা বেড়ার ফাঁকে ঢুকে গেল ঘরের ভিতরে। ঘরে ঢুকেই দরজাটা খুলে ফেলে—দম ফেলে না নবমী, বুঝি ভোর হয়ে গেল!

লখিয়া! কানের কাছে মুখ নিয়ে ডাকে মা—লখিয়া! চোখ খোলে লখিয়া। মাকে দেখে লাফিয়ে ওঠে, গলা জড়িয়ে ধোরে ডাকে—মা-ই! স্-স্-স্ মুখে হাত চেপে ইংগিত করে নবমী। চুপ্-চুপ! মিঠু, মিঠুরাম! ছেলেটাকে জাগাতে পারে না। অগত্যা কাপড় দিয়ে পিঠে ঝোলা কোরে বেঁধে তুলে নিল তাকে সেই ঝোলাতে। ছেলেটা আবার শব্দ করে! করুক! নেশা ভাংতে দেরী আছে।

মাথায় টোপলা তুলে নিল; কোমরে গেঞ্জিয়া যেমন ছিল তেমনই রইল; ডান হাতে লাঠি আর কাটারি তুলে নিতে ভোলে না; পিঠে ছেলে, বাঁ হাতখানা মেয়ের কাঁধে রেখে ঠেলে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। দেরী আর করা যায় না। এসে ওঠে পথে—উপায় আপনহাতে নিজেই কোরে নিতে হবে।

কিন্তু পথ ধোরে যাওয়া চলে না। যদি ভোরই হোয়ে গিয়ে থাকে। লোকজন যদি পথে বেরিয়ে এসে থাকে।

বাঁ হাতি মাঠের আল ধোরে নেমে আসে ডিকম নদীর ভাংগা পুলের ধারে। পুলটার মাঝে মাঝে কাঠ নেই। নিজের মনেই বলে নবমী—কানিখোয়া মানুহে চুরি করি বেচে খালে!—হায় রে আফিং-এর নেশা; মানুষকে চোর বানিয়ে তোলে। ঘুমের চোখে

মেয়েটা টাল খায় চলতে চলতে। মাথার উপরে আকাশে তাকায় আবার নবমী। একবার ভাবল দাঁড়িয়ে!

মেয়ের হাতে দেয় লাঠি আর কাটারি। লে, শকত করে রাখবি।—তুলে নেয় মেয়েকে কাঁখে। ভাবে—উপায় আপনকেই করতে হবে, নাই দেবে কেউ হাতে তুলে কুছু কিছু!

নীচে দিয়ে তোড় ছুটে চলেছে ডিকম নদীর—প্লাবনের তোড়। গেল সন্ধ্যার বর্ষণ-ধারায় পথ-ঘাট-মাঠ জলে জলময়। ডিকম টেনে ফুরতে পারেনি সারা রাত্রিতে; এখনও তাই পাক্ খেয়ে খেয়ে ছুটে চলেছে। নিজে নিজেই বলে নবমী—লরী-এর দৌড় পাকরলো শালা নদী।

মাঝে মাঝে একখানার বেশি তক্তাও তুলে নিয়ে গিয়েছে আফিংখোরেরা। নবমী নীচে তাকায়। ডিকম ছুটে চলেছে; জল তার পাকে পাকে ফুলে ফুলে উঠছিল। আবাব চোখ তুলে তাকায় আকাশে, রাত্রি আর নাই!—উপায় আপনকেই করে নিতে হবে!—মনে বল সঞ্চয় করে নেয় নবমী। বাঁচলে তিনজনই বাঁচবে, মরলে তিনটা প্রাণ একই সংগে আজই নিঃশেষ হয়ে যাবে। দুঃখ নেই কিছু; নবমীর দেহের রক্ত, তারই সংগে লোপ পেয়ে যাবে। ভাবে সে। ভালই হবে, হয় সে নিঃশেষে ফুরিয়ে যাবে, নয় তো নবজন্মের পথে ক্লেদমুক্ত হবে।

লাফিয়ে লাফিয়ে চলল; ফাঁকের পবে ফাঁক পুলের উপর দিয়ে পেরিয়ে এগোতে লাগল। ফুরায় না আর পুলটা।—কত ভারি দলং রে!—হাঁপাচ্ছে, কিন্তু থামছে না, এগিয়ে চলছিল অবিরাম অনলস পদক্ষেপে।

মাঠের জল পাড় ভাসিয়ে নামছে—কল্-কল্-কল্ ছল্ ছল্ আওয়াজ, দিগন্তে প্রতিধ্বনি তুলছে। নদীর উত্তর পাড় ধোরে এগিয়ে চলে, নবমী আগে আগে, পেছনে লখিয়া। পুলটা পার হোয়ে এসেই যেন নতুন জীবনের নবীন হাওয়ার স্পর্শসুখ বোধ করছিল; প্রভাতী হাওয়ায় যেন নবতর উৎসাহ দিয়ে তার সমস্ত অবসাদ সকল ক্লান্তি উড়িয়ে নিয়ে চোলে গেল। ঝোপ-ঝাড়-কাঁটা-সাপ-জোঁক—প্লাবনে ছেয়ে গেছে ডিকম নদীর দুই তীর। আগে আগে লাঠি দিয়ে জলেরই উপরে পিটিয়ে পিটিয়ে এগোয় নবমী; আওয়াজ পেয়ে পালাবে সাপ-ঘোপ।

কেউ কথা বলে না—মা নয়, মেয়েও নয়। ছেলেটা বুঝি আবার ঘুমিয়ে পড়ল, যেন পিঠের উপরে ভারি ভারি মনে হচ্ছিল। দাঁড়িয়ে আকাশ পানে তাকায় আবার। ভোর হোতে আর দেরী নেই; পূবের আকাশে শাদা আলোর আভাস জাগে। তবু ঘুমায় যদি ঘুমাক ছেলেটা। ভাবে—জাগিয়ে কায কি?

আরও লম্বা লম্বা পা ফেলে এগোয় নবমী; মেয়েটা পেছনে পেছনে দৌড়তে লাগল। কিন্তু দেরী তো করতে আর পারে না। মেয়েটার কষ্ট হচ্ছে—জল-পাঁক-খানা-ঢিবি—বারবার হোঁচট খাচ্ছে মেয়েটা। কিন্তু উপায় নেই। ভোর হোলেই তো খোঁজ খোঁজ হৈ-চৈ পোড়ে যাবে। পেছনে কাসা গাঁও ফেলে এসেছে, রামকানাই গাঁও-ও শেষ হোল ডান হাতে, মোড় ঘুরলেই ডিকম বাগিচা। প্রথম বাস ডিব্রুগড়ের তাকে ধরতে হবে; কেবলই আকাশ পানে তাকায় নবমী। পা-ফেলছিল যেন একটা জোয়ান মরদের মত।—উপায় আছে আপনকার হাতে! কেমন যেন

সাফল্যের আনন্দে বারবার স্ফীত হোয়ে উঠছিল তার বুক ; কেমন যেন আশার আলো তার হৃদয়ে ক্রমে স্পষ্টতর হোয়ে উঠতে লাগল।—উপায় নিজেই কোরে নিতে হবে।—পুরুষের সাহস জাগে মনে ; অশেষ ক্ষমতা বোধ করে অন্তরে।

বাগিচার ডালে ডালে ডেকে ওঠে পাখী ; শুনতে পেল দূরে দূরে পহেলী মোরগের ডাক। সামনে পূব আকাশে দীর্ঘ লাল রেখা ফুটে উঠেছিল ; ক্রমেই তা উজ্জ্বলতর হোয়ে উঠছিল দিগন্তের অন্তরাল থেকে। ঐ ঐ তো দেখা যায় !

—বগা-বগা, হৈ বড় আলিরে দলং লখিয়া, হো, আর দু কদম ! পহেলা বাস-এ পোয়া যাব।—নবমী যেন নেচে ওঠে। ঐ তো ঐ পুল ; ঐ পথেই যায় ডিব্রুগড়ের বাস। হাঁ, খুব চিনে নবমী। ঐ পুল, ঐ সরক। এই তো নদীর ডাইনে ডিকম বাগিচা ছাড়াল, ঐ তো ডান হাতে ইঁটাখোলা। হাঁ, শাদা শাদা ঐটেই তো পুল। ঐ পুলের ধারে থেকেই ধরবে সে ডিব্রুগড়ের প্রথম বাস, পৌঁছে যাবে শহরে ; ডিব্রুগড় শহরের প্রগতিশীল জনারণ্যে মিশে যাবে। কেউ আর খুঁজে পাবে না তাদের।

হাঁ ! আর দশ মিনিটে এসে যাবে বাস ঐ পুলের ধারে। সে তার আগেই উঠে যাবে পুলের উপরে। জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলে নবমী, যেন এতক্ষণ সে দমবন্ধ কোরে ছিল। ফিরে দাঁড়িয়ে এতক্ষণ পরে আবেগভরে ডাকে—লখিয়া !—মেয়ের হাতের কাটারিটা নেয় নিজের হাতে। চুমু খায় মেয়েকে।—বেটিয়া ! হো দলং !